উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা পর্যায়

তৃতীয় সেমেস্টার

কোর পত্র ৩০১(আবশ্যিক)

সাহিত্যতত্ত্ব

পর্যায় – ক

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় -ক

একক ১ - প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব - ভূমিকা

একক ২ - প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব - রস

একক ৩ - প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব - ধ্বনিবাদ

একক ৪ - প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব - অলংকার ও রীতি

একক ৫ - প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব – বক্রোক্তিবাদ ও ঔচিত্ত্যবাদ

একক ৬ - অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব

একক ৭ - 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের অন্যান্য তত্ত্ব

পর্যায় –খ

একক ৮ - রোমান্টিক কাব্যতত্ত্ব - রোমান্টিক যুগ

একক ৯ - রোমান্টিকতার কবি - ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজ

একক ১০ - রোমান্টিসিজিম এর অন্যান্য কবিরা - শেলী, কীটস ও বায়রন- রোমান্টিক কবিতা

একক ১১ - রোমান্টিক গদ্য সাহিত্য - স্কট ও ল্যাম্ব

একক ১২ - সাহিত্যের পথে - রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য

একক ১৩ - প্রবন্ধ বিশ্লেষণ

একক ১৪ - প্রবন্ধ বিশ্লেষণ

কোর পত্র – ৩০১(আবশ্যিক) সাহিত্যতত্ত্ব

পর্যায় –ক

একক ১ - প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব – ভূমিকা - 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম' ।

একক ২ - প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব – রস - রস কি? - ভাব ও রস - রসতত্ত্ব রস নয়, তত্ত্বমাত্র - কাব্যের জগত অলৌকিক মায়ার জগত - বিভাব অনুভাব ব্যাভিচারিসংযোগাদ রসনিষ্পত্তি ।

একক ৩ - প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব – ধ্বনিবাদ - ধ্বনিবাদ ও শব্দার্থশক্তি - ধ্বনিরাত্ম কাব্যস্য - বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের তুলনামূলক আলোচনা - ধ্বনির শ্রেণী বিভাগ।

একক ৪ - প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব - অলংকার ও রীতি - অলংকারবাদ – রীতিবাদ।

একক ৫ - প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব – বক্রোক্তিবাদ ও ঔচিত্ত্যবাদ – বক্রোক্তিবাদ - ঔচিত্যবাদ ।

একক ৬ - অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব - অ্যারিস্টটলের জীবনী - 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থটির সামগ্রিক পরিচয় - অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স গ্রন্থের দ্বারাই ইউরোপীয় সাহিত্য সমালোচনার সত্রপাত - ষড়ঙ্গ

শিল্পের অঙ্গ - ‘প্লটই ট্রাজেডির আত্ম, চরিত্র গৌণ' - ট্রাজেডির নায়ক চরিত্র ।

একক ৭ - ‘পোয়েটিক্স’ গ্রন্থের অন্যান্য তত্ত্ব - মহাকাব্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ - মহাকাব্য ও ট্রাজেডি সম্পর্ক - ট্রাজেডির ত্রিবিধ ঐক্য - মাইমেসিস' বা 'অনুকরণ’ তত্ত্ব - 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে ব্যবহৃত ‘ক্যাথারসিস’ – কমেডি ।

একক ১ - প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব - ভূমিকা

বিন্যাসক্রম

১.১ 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম'

১.২ অনুশীলনী

১.৩ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম'

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র এর চিরন্তন আলোচকগণ শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক নিয়ে কাব্য রচনার সূত্রপাত করেন অর্থাৎ আলোচনার ক্ষেত্রে তারা শব্দের অর্থের আলোচনা কে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বিখ্যাত আলঙ্কারিক ভামহ বলেছেন 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম'। এর বাংলা অর্থ হল শব্দ ও অর্থের সহযোগে কাব্য সৃষ্টি হয়।শব্দ ও অর্থের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক বিচারের আগে শব্দ বলতে আমরা কি বুঝি, সেই আলোচনা করা প্রয়োজন। ব্যাকরণগত দিক থেকে শব্দ বলতে আমরা বুঝি কতগুলো অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টিকে অর্থাৎ যখন কতগুলি ধ্বনি পাশাপাশি বসে অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে আমরা শব্দ বলি। শব্দের সঙ্গে অর্থের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কখনো অস্বীকৃত হয়নি। কিন্তু সংস্কৃত আলংকারিক কোন কাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে শব্দ ও অর্থকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। আমরা সবাই জানি যে শিল্পের জগৎ বহুধাবিভক্ত। কাব্য ,চিত্রকলা ,ভাস্কর্য শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি আলাদাভাবে শিল্প তাৎপর্যলাভ করলেও এগুলোর মাধ্যম এক নয়। চিত্রকর রং তুলির সাহায্যে মনের ভাব ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলেন, ভাস্কর পাথর খোদাই করে কিংবা মৃৎশিল্পী মাটির ওপর নানা বিভঙ্গ রচনা করে মরতে করেন আবার যারা কবি ও সাহিত্যিক তারা শব্দ দিয়ে ছবি আঁকেন

তাই কবি-সাহিত্যিকদের অনেকেই বাকশিল্পী বলে অভিহিত করেন যেহেতু শব্দ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারেনা তাই সংস্কৃত আলংকারিক গণ কাব্যআলোচনায় শব্দকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

কাব্যে সঙ্গে মানুষের তুলনা করা যায়। একটি মানুষ সম্পূর্ণতা পায় কেবল তাহার দেহে নয়,আত্মাতেও। প্রাণ যুক্ত মানুষ হল যথার্থ মানুষ। তার মধ্যে আমরা আত্মাকে খুঁজি। যে মানুষের কেবল শরীর আছে কিন্তু প্রাণ নেই তাকে আমরা সম্পূর্ণ মানুষ বলতে পারিনা। তাই মৃত মানুষের সঙ্গে অচেতন বস্তুরই নিকট সম্বন্ধ। কাব্য আলোচনায় যারা শব্দ ও অর্থকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন তারা কাব্যের আত্মটিকে অস্বীকার করেছেন। তবুও 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম' বলতে সঠিক অর্থে কী বোঝানো হয়েছে তার আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।শব্দ অর্থের মধ্যে সম্পর্ক রচিত হলে যদি কাব্য হতো তবে যেকোনো বিবৃতির মধ্যে কাব্য খোঁজা যেত। যেমন যদি বলা হয় রাম স্কুলে যায় কিংবা গাছে গাছে ফুল ফুটেছে তবে এই দুটি বিবৃতি বাক্যের মধ্যে কাব্য অন্বেষণ করা যেতে পারও। কিন্তু বিবৃতি দুটির মধ্যে কাব্য নেই বলেই আমরা তার মধ্যে কাব্য অন্বেষণের চেষ্টা করব না ।অথচ শক্তি চট্টোপাধ্যায় যখন বলেন "কিন্তু তুমি নেই বাহিরে অন্তরে মেঘ করে/ ভারী ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরে" তখন বিবৃতিটি কাব্য হয়ে ওঠে। শব্দ ও অর্থ যদি কাব্যরচনা একমাত্র শর্ত হতো তবে শক্তি চত্তপাধ্যায়ের কবিতার মতো প্রথম বিবৃতিও কাব্য হতো ।কিন্তু তা যখন হয়নি তখন 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম' কে নিশ্চয়ই

অন্য অর্থে ব্যবহার করেছিলেন ভামহ।

শব্দ ও অর্থের মিলিত সম্পর্কটি বোঝাতে ভামহ প্রথম 'সহিত' শব্দটি ব্যবহার করেন। যদিও এই 'সহিত' শব্দটির মধ্যে আরো গভীর অর্থ লুকিয়ে আছে। ভামহ 'সহিত' শব্দটির দ্বারা শব্দের ব্যাকরণগত শুদ্ধি ও ঔচিত্যের কথা বঝাতে চেয়েছেন। তিনি যাই বুঝাতে চান না কেন তার সংজ্ঞাটি অব্যাপ্তির দোষে দুষ্ট। আচার্য কুন্তক তার 'বক্রক্তি জীবিত' গ্রন্থে শব্দ ও অর্থ বলতে বলেছেন-

শব্দো বিবক্ষিতার্থৈবাচকোহন্যেষু সৎস্বপি

অর্থঃ সহৃদয়াহ্লাদকারি- স্বস্পন্দ সুন্দরঃ

এর অর্থ হল, অন্য একটি বাচক থাকলেও যা বিবক্ষিত অর্থাৎ অভিপ্রেত অর্থের বাচক হয় তাকেই বলে শব্দ। ব্যক্তির মনে আনন্দ সৃষ্টি করে স্বভাবে যা সুন্দর হয়ে ওঠে তাকে বলে অর্থ। কুন্তকের বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দের সঙ্গে কাব্যে ব্যবহৃত শব্দের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। কবিতা যেহেতু শিল্প তাই সেখানে ব্যবহৃত শব্দগুলো আভিধানিক অর্থের মধ্যে সীমিত থাকে না। কাব্য রচনার পিছনে কবির বিশেষ অভিপ্রায় কাজ করে । তা সফল হয় যদি তিনি তার অর্থটিকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারেন। সুতরাং অর্থের উপযোগী শব্দ দিয়ে কবিকে কাব্য রচনা করতে হয়। প্রতিনিয়ত আমরা যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করি তার সঙ্গে আভিধানিক অর্থের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকলেও আনন্দের যোগ থাকেনা। কিন্তু কবি কাব্যরচনা কালে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেন এবং সে শব্দগুলি যে অর্থ পরিস্ফুট করে তার সঙ্গে আনন্দের একটি যোগ আছে। এর কারণ হলো প্রতিভাবান কবি বস্তুর বহিরঙ্গ গ্রহণ করে ক্ষান্ত থাকেন না, তিনি অন্তর্জগতে প্রতিষ্ঠা করে তা ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করে ভাবময় রূপদান করেন।সুতরাং ভাবের দ্বারা পরিচালিত হয় উপযোগী শব্দের অন্বেষণ করতে হয় কবিকে।ভাবের দ্বারাই কবির অভিপ্রায় ব্যাক্ত হয়।অভিপ্রায় শব্দের অর্থ হল আহ্লাদজনক এবং তা যে কোন সহৃদয় পাঠকের মনে আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে। শব্দ ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধে বুঝতে গেলে প্রথমে মনে রাখা দরকার যে শব্দ যেমন অর্থকে ব্যঞ্জিত করে, তেমনি অর্থও শব্দকে অবলম্বন করে। কুন্তক শব্দ ও অর্থে যে সহিত তত্ত্বের কথা বলেছেন তাতে শব্দ বলতে অভিপ্রেত অর্থ সংবলিত শব্দ এবং অর্থ বলতে সহৃদয় মনে আনন্দদানকারী অর্থকে বোঝানো হয়েছে। ‘ বক্রোক্তি জীবিত’ গ্রন্থের অন্যত্র তিনি বলছেন-

শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনি

বন্ধে অবস্থিতৌ কাব্যাং তদ্বিদাহ্লদকারিনি।

অর্থাৎ শহীদ বা মিলিত শব্দার্থ কাব্যজ্ঞদের আহ্লাদজনক বক্রতাময় কবিব্যাপার পূর্ণ

রচনাবন্ধে বিন্যস্ত হলে কাব্য হয়। বিষয়টি স্পষ্ট করতে তিনি আরো বলেছেন সাহিত্য হচ্ছে 'শব্দার্থের পরস্পর সাম্য সুভগ অবস্থান' অর্থাৎ শব্দের অর্থের পারস্পারিক সমতা ও সৌন্দর্য রক্ষিত হলে কাব্য সৃষ্টি হয়। কুন্তকের মতে সাহিত্য হচ্ছে শব্দার্থের এমন এক শোভাশালী বিন্যাস ভঙ্গী যা নূযনতা থেকে অতিরিক্ততা বর্জিত হয়ে মনোহারী হয়। এর থেকে বোঝা যায় শব্দ অর্থের সম্বন্ধের মধ্যে অল্পতা বা বাহুল্য কোনটাই থাকা উচিত নয়। তার গ্রন্থে তিনি শব্দের অর্থ সম্পর্কে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে অনেক অস্পষ্টতা দূর হয়ে গেছে।ভামহের শব্দার্থ বিষয়ক আলোচনা কিন্তু কুন্তকের মতো বিস্তৃত ও স্পষ্ট নয়।

আচার্য দণ্ডী শব্দার্থের সম্পর্কটি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে 'অভীষ্ট অর্থ সংবলিত পদাবলী হল কাব্য'। এর অর্থ হল কবির কাব্য মধ্যে একটি অভীষ্ট অর্থ থাকবে। এই অর্থের কোথায় কবি প্রতিভা ও কবি মনের সঙ্গে তার যোগসুত্র রচিত হয়ে যায়। এই ঈপ্সিত অর্থ সৃজন করা যার তার কাজ নয়। তাইতো জীবনানন্দ বলেছিলেন 'সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি'। কবি সৃষ্ট ঈপ্সিত অর্থময় বাক্যের সঙ্গে সাধারণ বাক্যের অনেকটাই তফাৎ। সাধারণ বাক্যের সঙ্গে কবি মনের যোগ নেই তাই টা আহ্লাদজনক নয় ।

১.২ অনুশীলনী

১।'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম' আলোচনা করো।

১.৩ গ্রন্থপঞ্জী

১।ধ্বন্যালোক- সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত

২। কাব্যলোক- সুধীর কুমার চক্রবর্তী

৩। কাব্য জিজ্ঞাসা- অতুলচন্দ্র গুপ্ত

৪।কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা - অচিন্ত্য বিশ্বাস

৫।ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব - অবন্তীকুমার সান্যাল

একক ২ - রস

বিন্যাসক্রম

২.১ রস কি?

২.২ ভাব ও রস

২.৩ রসতত্ত্ব রস নয়, তত্ত্বমাত্র

২.৪ কাব্যের জগত অলৌকিক মায়ার জগত

২.৫ বিভাব অনুভাব ব্যাভিচারিসংযোগাদ রসনিষ্পত্তি

২.৬ অনুশীলনী

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

ভূমিকা

যদি প্রশ্ন করা হয় আমরা কাব্য পাঠ করি কেন তাহলে এক কথায় উত্তর আসবে আনন্দের জন্য। কাব্য পাঠ এর ফলে আমাদের জাগতিক কোন লাভ নাই হল, আমরা রস আনন্দ লাভ করি।এই রস আসলে কি পদার্থ ,কাব্যে তার গুরুত্ব কতটতা,তাকে কাব্যের আত্মা বলা যায় কিনা, কিভাবে রসের অভিব্যক্তি ঘটে ইত্যাদি নানা জটিল প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণে সংস্কৃত আলংকারিক করেছেন। ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের জিজ্ঞাসু পাঠক হিসেবে আমাদের এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা প্রয়োজন।কারণ আমরা কাব্যের আত্মার সন্ধানে বেরিয়েছি ।শব্দার্থ অলংকার ইত্যাদি পার হয়ে আমরা এই জগতের কাছাকাছি পৌঁছেছি। এ জগতে শুধু আনন্দ বিরাজ করে। কাব্য

পাঠকের আনন্দ অন্য কিছু নয়, আনন্দ উপলব্ধি করতে পারলে ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র দুর্গম পথ আমাদের সফল হবে। এই সাফল্যের ভাগিদার হতে আমাদের রস বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রায় দুহাজার বছর আগে ভরত 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে রস কি পদার্থ সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। প্রশ্ন তুলে ভরত ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি নিজে তার যথাযোগ্য উত্তর দিয়ে বলেছেন নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তুলেছিলেন , পরবর্তীকালে তা বিশেষ চর্চিত হয়নি। কিন্তু নবম শতকের ধ্বনিবাদিদের আলোচনায় রসের প্রসঙ্গটি গুরুত্ব পায়। এই শতকে আনন্দবর্ধন 'রসধ্বনি'কে কাব্যের আত্মা রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। দশম, একাদশ শতকে অভিনবগুপ্ত ধ্বন্যালোকের মূল কারিকার ও আনন্দবর্ধনকৃত বৃত্তির 'লচনটীকা' লেখেন। তারপর থেকে পুনরায় রসের আলচনায় জোয়ার দেখা যায়। বিভিন্ন শতাব্দীতে আচার্য বিশ্বনাথ, জগন্নাথ, কবিকর্ণপুর রসের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

২.১ রস কি?

সংস্কৃতে রস ধাতুর অর্থ হলো আস্বাদন।এই 'রস' ধাতু থেকে 'রস' শব্দটির উৎপত্তি। যাকে আস্বাদন করা যায় তাকে রস বলে। মধুর ,কটু ,অম্ল , তিক্ত , কষায় হল রস, কেননা এর সবগুলোই আমরা জিভ দিয়ে আস্বাদন করে থাকি। জিভ আস্বাদনের মাধ্যম বলে জীভের আরেক নাম রসনা। ইংরেজিতে বলা যেতে পারে 'taste organ'। সাহিত্য ক্ষেত্রেও রস শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ একই। এখানেও 'আস্বাদন' অর্থে আমরা রসকে গ্রহণ করে থাকি। তবে সাহিত্যে যে রস আস্বাদ্য, তা আমাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভব হয় না। কারণ সাহিত্যে বস্তুর নির্যাস পরিবেশিত হয় না, সাহিত্যিক নির্যাস পরিবেশিত হয়। তাই সাহিত্যের রস আস্বাদনের ইন্দ্রিয় গুলির গুরুত্ব হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে রসনেন্দ্রিয় বা পাঠকের অন্তরেন্দ্রিয়। একমাত্র সহৃদয় সামাজিকের অনুভূতিপ্রবণ মন কাব্যরস আস্বাদনের অধিকারী। আচার্য

বলেছেন যে ‘ রসের আস্বাদ’ কথাটির দ্বারা রস ও স্বাদের মধ্যে একটি ভেদরেখা টানা হয়। কিন্তু এটা নিতান্তই কাল্পনিক। কারণ আমরা যেমন কথা বলি ‘ ভাত পাক হচ্ছে’ অথচ

পাকের যা ফল তাই হলো ভাত। তেমনই যদিও আমরা বলি রসের অনুভূতি কিন্তু অনুভূতি হচ্ছে রস। বহু কাব্য অধ্যাবসায়ের ফলে যাদের মনমুকুর স্বচ্ছ হয়েছে, সেই স্বচ্ছ মনমুকুরে কাব্যের বর্ণনীয় বস্তুর যে তন্ময়তা প্রাপ্ত হয় , তেমনি দরদী লোকের সুকাব্যজনিত চিত্তের অনুভুতির নামই হলো রস।

২.২ ভাব ও রস

রসের আলোচনায় অগ্রসর হয়ে আমরা দেখব কতগুলি ভাব রসসৃষ্টিতে সহায়তা করে। কিন্তু এ ভাব ও রস এক জিনিস নয়। ভাব জিনিসটা লৌকিক, আর রস হল অলৌকিক। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কিছু কিছু ভাব থাকে

এবং অনেক সময় সেই ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। যেমন প্রিয় মানুষের মৃত্যুতে অন্তরে শোকভাব জাগ্রত হলে আমরা কাঁদি। প্রিয়জনের মৃত্যু হল শোকভাবের কারণ। কিন্তু লৌকিক জগতের এই শোক রস নয়। কবি যখন তার প্রতিভার মায়াবলে এই লৌকিকতার কারণে অলৌকিক চিত্র ফুটিয়ে তোলেন তখন পাঠকের মনে অলৌকিক করুণ রসে জাগরণ ঘটে। লৌকিক ভাবগুলি বিভিন্ন রকম হলেও অর্থাৎ শোকভাব, হাসভাব, রতিভাবের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এগুলি থেকে জাত করুণরস, হাস্যরস ও শৃঙ্গাররসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এই রসের সবগুলি আনন্দের কারণ। আচার্য অভিনবগুপ্ত তাই বলছেন যে, রস হল একটা মানসিক অবস্থা এবং তা নিজের আনন্দময় সম্বিত বা চেতনার আস্বাদরূপ একটি ব্যাপার। ভাব ও রসের মধ্যে পার্থক্যটুকু মনে না রাখলে কাব্যরস আস্বাদনের ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

২.৩ রসতত্ত্ব রস নয়, তত্ত্বমাত্র

কাব্যের সঙ্গে কাব্যতত্ত্বের পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য বোঝা আমাদের পক্ষে একান্ত জরুরী। জ্ঞানের জগৎ ও ভাবের জগতের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ একবার বলছিলেন, "জ্ঞানের কথা একবার জানিলে আর জানতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু ভাবের কথা বারবার অনুভব করিয়া শ্রান্তি বোধ হয় না।" এর কারণ লুকিয়ে আছে অলৌকিক জগতের আনন্দ আস্বাদের মধ্যে। সার্থক কাব্যের মধ্যেজে রসধ্বনি থাকে তাই সহৃদয় আনন্দের কারণ হয়। কিন্তু তত্ত্ব গ্রন্থ পাঠ করে আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটলেও তা আমাদের আনন্দ দিতে পারেনা। রসতত্ত্ব বলতে যদি রসতত্ত্ব জ্ঞানকে বোঝায় তবে সে জগত একান্ত শুষ্ক। সেখান থেকে অলৌকিক কাব্য জগতের রস প্রত্যাশা করা বৃথা। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের জিজ্ঞাসু ছাত্র হিসেবে কেবল রসের জগতে মজে থাকলে চলে না, তত্ত্বের কাঠিন্যটুকু স্বীকার করে না নিলে শিক্ষাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এমন ভাবার কোনো কারণ নেই যে

দেহতত্ত্ব বা ডাক্তারি ছাত্রদের মনে রসের কোনো অস্তিত্ব নেই। যদি তা হতো তাহলে পরশুরামের মত রসায়নবিদ কিংবা অভিজিৎ তরফদার ও বনফুলের মতো ডাক্তার সাহিত্যিক আমরা পেতাম ন। তবু তাদের জীবিকার প্রয়োজনে হয়তো একদিন মানুষের শরীর নিয়ে কাটাছেড়া করতে হয়েছিল। অভিজিৎ বা বনফুল মানুষ নিয়ে সাহিত্য লিখেছে আনন্দ পেতেন সেই আনন্দ কি পেয়েছেন দেহের কঙ্কাল ঘেঁটে? সে আনন্দ করা সম্ভব নয় কারণ জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনে তাদের দেহ ব্যাবচ্ছেদ করতে হয়েছিল। আর জ্ঞানের কথা একবার জানা হয়ে গেলে তার প্রতি আর কোন মানুষের আগ্রহ থাকে না। সূর্য যে গোল তা জানা হয়ে গেলে আমরা এ নিয়ে আর মাথা ঘামাই না। অনুরূপভাবে যেদিন গাছ থেকে আপেল মাটিতে পড়ে ছিল সেদিন নিউটনের মনের মধ্যে বিস্ময় ছিল ঠিকই কিন্তু কাব্যের মাধ্যমে অলৌকিক আনন্দের বস্তু করে তুলতে চাননি। আপেল মাটিতে পড়ার সূত্রে তিনি প্রচার করলেন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব বিষয়টি। এটি একেবারে লৌকিক জগতের বিষয়। এই তত্ত্ব জেনে আমাদের জ্ঞান

বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু আমরা আনন্দিত হইনি। আজ মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আমাদের কাছে এতই পরিচিত যে ওটা নিয়ে

আমরা বিশেষ আগ্রহী নই। কতদিন আগে কালিদাস রচনা করেছিলেন 'মেঘদূত'। সেই বিবর্ণ পাতা খুলে বসলে আনন্দে ভরে উঠে মন। রসের জগতে আছে আনন্দ কিন্তু রসতত্ত্ব জগতে আছে শুষ্ক জ্ঞান। রসের আবেদন চিরন্তন কিন্তু, রসতত্ত্বের আবেদন ক্ষণিক।

২.৪ কাব্যের জগত অলৌকিক মায়ার জগত

অধিকাংশ আলংকারিক কাব্যের জগতকে অলৌকিক মায়ার জগৎ বলে অভিহিত করেছেন এবং তারা একবাক্যে স্বীকার করেছেন রস জিনিসটা হল অলৌকিক। অবশ্য এই শব্দটির অর্থ নিয়ে নানা মতভেদ আছে। তাই অলৌকিক বলতে ঠিক কী বোঝায় আমাদের কাছে অনেক সময় স্পষ্ট হয়। কেউ কেউ অলৌকিক বলতে অতিপ্রাকৃতিক বা সুপার ন্যাচারালকে বুঝতে পারেন, কিন্তু কাব্য তো মানুষের জগতের সুতরাং অলৌকিক হতে যাবে কেন? এর উত্তরে রসবাদীরা বলেছেন অলৌকিক শব্দের অর্থ অতিপ্রাকৃত নয় আবার লৌকিক নয়। লৌকিক জীবনের উপলব্ধি থেকে এগুলো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। এটি হলো এক ধরনের মানসিক অবস্থা। অধ্যাপক সুধির কুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন ' যাহা লৌকিক নয় তাহাই অলৌকিক। যে লৌকিক জগতে দুস্মন্ত ও শকুন্তলা বিচরণ করতেন তা বহুকাল গত হইয়াছে। এখন তাহারা কবি প্রতিভার বলে শব্দে সমর্পিত হইয়া বাঙময় বপু লইয়া কাব্য জগতের অধিবাসী। কবি সৃষ্ট কাব্য জগত এক মায়ার জগৎ, অলৌকিক জগৎ। এই নিমিত্ত যাহা ছিল লৌকিক বা ব্যবহারের জগতের কারণ বা কার্য ,তাহাই অলৌকিক কাব্যজগতে অলৌকিক বিভাব ও অলৌকিক অনুভাব হইয়া সামাজিক ও পাঠকের চিত্তে অলৌকিক রসের সঞ্চার করিতেছে। এই অলৌকিকত্ব না থাকিলে তাহারা আমাদের চিত্তে রস নয়,কেবল ভাব জন্মাইত, যেমন জন্মাইত দুস্মন্ত শকন্তলা তাদের সখীদের মনে।

চিত্তের ভাব প্রায় সকল সময় লউকিক।তাহার আশ্রয় জাত রস সর্বদাই অলৌকিক ও কাব্য জগতের বিভাবাদিও অলৌকিক।" এই কারণে অতুল চন্দ্র গুপ্ত তার 'কাব্যজিজ্ঞাসা' গ্রন্থে বলেছিলেন যে সমস্ত মনের ভাব রসে রূপান্তরিত হয় তারা অবশ্যই লৌকিক। লৌকিক ঘরকন্নার জগতে ইমোশনগুলো রস নয় এবং মানুষের মনে যে যে কারণেই ভাবের জাগরণ ঘটে তাও কাব্য নয়। লৌকিক জগতের কোনো মৃত্যু যদি কোন নিকটাত্মীয়ের মনে শোকভাব জাগ্রত করে তবে সেই শোকভাবটি যেমন রস নয়, তেমনি সেই শোকের কারণটিও কাব্য নয়। কিন্তু কবি যদি এই লৌকিক শোকভাবকে কাব্য জগতের অলৌকিক করে তুলতে পারেন তবে তা সহৃদয়ের মনে করুণ রসের উদ্রেক ঘটায়। এ করুণ রসকে শোকভাবের সঙ্গে মিশিয়ে ফেললে ভুল হবে। শোকভাবটি ছিল

লৌকিক জগতের বিষয় কিন্তু তা যে করুণ রসের জন্ম দিল তা লৌকিক জগতের বিষয় থাকলো না, হয়ে উঠল অলৌকিক কাব্যজগতের বিষয়।

একটি ঘটনায় আমাদের মনে এক একরকম ভাব জাগে। কেউ মারা গেলে জাগে শোকভাব, কারো অসংযত আচরণ দেখলে জাগে হাসভাব। কিন্তু এই উভয় ভাব থেকে জাত করুণরস ও হাস্যরস আনন্দেরই জন্ম দেয়। আমরা স্বেচ্ছায় দুঃখের মুখোমুখি হতে চাইনা। শোকভাব থেকে জাত করুণ রসের কাব্য পাঠ করে আমাদের মন যদি দুঃখ ভারাক্রান্ত হতে দূরে থাকতাম, কিন্তু তা হয় না বলেই কোন রসের কাব্য পাঠে আমরা আগ্রহ দেখাই। ইংরেজ কবি বলেছেন our sweetest songs are those that tell of saddest thought. কিন্তু মনে রাখা দরকার বাস্তবে কোন ঘটনা যা সরাসরি আমাদের মনে sad thought নিয়ে আসে তা যাই হোক sweet or song কোনটাই নয়। কবি যখন কাব্যের মধ্যে saddest thought এর কথা বলেন তখন তা হয় ভাব ও রসের জগতের। এই পার্থক্য মনে রাখলে রস ও কাব্যের জগত কেন অলৌকিক মায়ার জগত এবং তা কেনইবা সহৃদয় পাঠকের আহ্লাদের কারণ সেটি বোঝা যায়।

২.৫ বিভাব অনুভাব ব্যাভিচারিসংযোগাদ রসনিষ্পত্তি

ভরতের এই সূত্রটি ভালোভাবে বুঝতে হলে বিভাব অনুভাব ব্যাভিচারিভাব কাকে বলে এবং কিভাবে তার রস নিষ্পত্তি ঘটে বিস্তৃত আকারে তা জানা প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে স্থায়ীভাব গুলির পরিচয় নেওয়া দরকার।

ক) বিভাব

বিভাব শব্দের অর্থ হলো কারণ, অর্থাৎ রস অনুভূতির কারণ। লৌকিক জগতের সবকিছুই আমরা বাইরের ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করি। কেউ মারা গেলে শোকভাবে আচ্ছন্ন হই, বিসদৃশ কিছু দেখলে হাসভাব জাগে, আবার

ভূমিকম্পের মতো ঘটনা ঘটলে মনের মধ্যে ভয় ভাব জাগে। জগতের মধ্যে এই ভাব জাগ্রত হওয়ার পেছনে বিশেষ কতগুলি কারণ বা ঘটনা থাকে।যেমন কেউ মারা যাওয়া বা বিসদৃশ কিছু দেখা বা ভূমিকম্প হওয়ার ভাব গুলি যেমন লৌকিক জগতের বিষয় তেমন ভাবের কারণগুলি হল লৌকিক। কিন্তু এগুলি যখন অলৌকিক কাব্য বা নাটকে নিবেশিত হয় তখন তাদের বিভাব বলে। লৌকিক জগতে যা বিভিন্ন ভাবের উদ্বোধক, কাব্যে বা নাটকে তা হল বিভাব। লৌকিক জগতের রাম ,সীতা , দুষ্মন্ত,শকুন্তলা প্রত্যেকেই হলেন কারণ। এরা যখন কবিদের হাতে পড়ে কাব্যের চরিত্র হয়ে উঠছেন তখনই হয়ে গেছেন বিভাব। শকুন্তলার রূপ-লাবণ্য সৌন্দর্য ও যৌবন রাজা দুষ্মন্তের মনে ভাবে জাগরণ ঘটাতে পারে আর এটাই যখন কাব্যে ব্যবহৃত হয় তখন হয়ে যায় বিভাব। বিভাব আবার দু'রকম হয় - আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব।

আলম্বন বিভাব

আলম্বন শব্দের অর্থ হলো বিষয় বা চিত্তবৃত্তির বিষয়। আমাদের চিত্তের যতকিছু বৃত্তি বা বিকার আছে তা কোনো না কোনো একটি নির্দিষ্ট বস্তুকে বা বিষয়কে অবলম্বন করে উদ্ভূত হয়। প্রধানত যে বস্তুকে বা বিষয়কে অবলম্বন করে রস উৎপন্ন হয় তাকে আলম্বন বিভাব বলে। ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম’ নাটকে দুষ্মন্তের হৃদয়ে যে রতি

ভাবের আবির্ভাব বর্ণিত রয়েছে তার আলম্বন বিভাব হলো শকুন্তলা।অন্যরূপে শকুন্তলার রাজা দুষ্মন্ত কে দেখে তার প্রতি অনুরক্ত হন। তাই রাজা দুষ্মন্ত হলেন শকুন্তলার আলম্বন বিভাব। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণ হলেন পরস্পরের আলম্বন, কারণ তাদেরকে অবলম্বন করে মধুর রস পরিবেশিত হয়েছে।

এ আলম্বন বিভাবকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। আশ্রয় আলম্বন ও বিষয় আলম্বন। বৈষ্ণব পদাবলীর অনেক পদে যে রতি নামক স্থায়ীভাব আছে তার আশ্রয় হলেন শ্রীরাধিকা। তাই শ্রীরাধিকা হলেন আশ্রয় আলম্বন। অপর দিকে কৃষ্ণ হলেন বিষয়। কারন তাকে অবলম্বন করে রাধার মনে রতি জাগ্রত হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ উক্ত স্থায়ীভাবের বিষয় বা বিষয়ালম্বন।

উদ্দীপন বিভাব

যেসব বস্তু বা পারস্পরিক অবস্থা অলৌকিক ভাবরসের উদ্দীপনে সহায়তা করে তাকে উদ্দীপন বিভাব বলে। মনের মধ্যে কোন ভাব উদ্দীপিত করতে গেলে তার উপযুক্ত পরিবেশ থাকা আবশ্যক। পরিবেশের আনুকূল্য না পেলে ভাব উদ্দীপিত হতে পারে না। তাই দেখা যায় বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীরাধিকার অন্তরে রতিভাব উদ্বোধনে কালো কালিন্দীর জল, ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠ বর্ণ ,কালো চুল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নিয়েছে। এগুলোর সূত্রে কৃষ্ণকে মনে পড়েছে রাধিকার। তার অন্তরে এগুলি উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে। এর সবগুলোই উদ্দীপন বিভাবের উদাহরণ। শকুন্তলা নাটকের দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার রূপ সৌন্দর্য , বেশভূষা রতিভাবের উদ্দীপন বিভাব।

খ) অনুভাব

অনুভাব শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল পশ্চাৎ (অনু) ভাবিতা (ভাব)। অর্থাৎ ভাবের সাথে যা আসে বা প্রকাশ পায় তাকে অনুভাব বলে। ব্যবহারিক জগতে আমাদের হৃদয় যখন কোন ভাব জন্ম নেয় তখন বিভিন্ন শরীর চেষ্টার দ্বারা আমরা তা প্রকাশ করি। যেমন খুব রেগে গেলে আমাদের শরীর শক্ত করে কাঁপতে থাকে। প্রিয়জনের মৃত্যুতে চোখ দিয়ে জল পড়ে। ব্যবহারিক জগতের এজাতীয় আচরণগুলি যখন কাব্যে বর্ণিত

হয় তখন তাকে অনুভাব বলে। মনে ভাব উদ্বুদ্ধ হলে যে সব স্বাভাবিক বিকার যে উপায়ে বাইরে প্রকাশিত হয়, ভাবরূপ কারনের

সেইসব লৌকিক কাজ কাব্য নাটকের অনুভাব। ইংরেজিতে বলতে গেলে এগুলিকে emotion এর expression বলা যেতে পারে। এক্সপ্রেশন ছাড়া ইমোশন যেমন স্ফূর্তি লাভ করতে পারেনা, তেমনি অনুভাব ছাড়াও ভাবের

স্ফূর্তি ঘটে না। অন্তরের মধ্যে ভাবোদয়ের কারণ হলো বিভাব। আর সেই কারণ এর কার্য হল অনুভাব। বিভাবের মত অনুভাবগুলিও হল অলৌকিক।

গ) স্থায়ী ভাব

বাসনা শুন্য হয়ে মানুষ কখনো পৃথিবীতে জন্ম লাভ করে না। মানুষের কিছু কিছু বাসনা, প্রবৃত্তি হলো সহজাত। যতদিন রক্তমাংসের মানুষ পৃথিবীতে থাকবে ততদিন এই বাসনা থাকবে। তাই দীর্ঘকালের অভিব্যক্তির বসে যে সমস্ত বাসনা মানুষের মনের মধ্যে দৃঢ়মূল হয়ে গেছে তা বৃদ্ধ থেকে শিশুতে , এক যুগ থেকে এক যুগে সঞ্চারিত হবেই। এ বাসনার কোন শেষ নাই। মানুষের মনোজগতে এরকম শত শত বাসনার দ্বারা প্রতিনিয়ত আন্দোলিত হচ্ছে।এবার প্রবৃত্তিকে সাহিত্য মীমাংসকগণ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। স্থায়ী ও সঞ্চারী। আমাদের চিত্তে অনন্ত ভাবরাজির মধ্যে যেগুলো সর্বদা গূঢ় ভাবে বর্তমান রয়েছে সেগুলো হলো স্থায়ীভাব। চিত্তবৃত্তির মধ্যে এই ভাবগুলি প্রতীয়মান হয় বলেই এগুলো স্থায়ী। আলঙ্কারিকগণ তাদের কাজের সুবিধার জন্য এরকম নয়টি স্থায়ীভাবের স্বীকৃতি দিয়েছেন। এগুলি হল রতি , হাস , শোক , ক্রোধ , উৎসাহ ,ভয় ,জুগুপ্সা , বিস্ময় ও শম। অভিনব গুপ্ত ওই নয়টি ভাবকে মাত্র স্থায়ী বলেছেন। কেননা প্রাণী জন্মবার সঙ্গে সঙ্গেই এ কটি বাসনার দ্বারা ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। এই সকল চিত্তবৃত্তি বিরহিত হয় কোন প্রাণী জন্ম নিতে পারে না। তাই সকলেই জন্ম লাভের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয় ও সুখের জন্য লালায়িত হয়। ইপ্সিত বস্তুর বিয়োগে মানব চিত্তের শোকাকুল স্বভাব কিংবা বিষম বস্তু দর্শনে ভয় পাওয়া মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম । আলংকারিক যে নয়টি ভাবের কথা বলেছেন তাদের কখনো সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা যায় না। তারা চিরন্তন অক্ষয় অব্যয়।

এদের উদয় বা বিলয় কোনটাই নেই। বিশ্বনাথ কবিরাজ এগুলিকে আস্বাদরূপ অঙ্কুরের মূল বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ এগুলোর একমাত্র রসপরিণতি ঘটে।এরা আস্বাদরূপ অঙ্কুরের মূল বলেই স্থায়ী। স্থায়ী ভাব থেকে যে সমস্ত রসের সৃষ্টি হয় সেগুলি হল শৃঙ্গার , হাস্য , করুন , রৌদ্র , বীর , ভয়ানক , বীভৎস , অদ্ভুত ও শান্ত।

ঘ) ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাব

ব্যভিচারী শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হল বি (বিশেষ) অভি (স্থায়ীর অভিমুখে) চরণ করে যারা। অর্থাৎ যে সমস্ত ভাব স্থায়ীভাবের অভিমুখে চারণ করে তাদের ব্যভিচারী বা সঞ্চারি ভাব বলে।ব্যভিচারী স্থায়ীভাবে মতই কিছু ভাব কিন্তু স্থায়ীর সঙ্গে তার পার্থক্য হলো তারা স্থায়ী অভিমুখে বিচরণ করে। তারা স্থায়ীর মধ্যেই কখনো ডোবে আবার কখনো ভেসে ওঠে। স্থায়ীর মত এই ভাবগুলি মনের মধ্যে বহুল রূপে প্রতীয়মান নয়, তাই কখনোই মনের মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে থাকেনা । মূল ভাবগুলির সূত্রে তারা মনের মধ্যে চলাফেরা করে। মূলভাবের পুষ্টি সাধন করে। স্থায়ীভাবের মধ্যেই এদের উদয় এবং বিলয় ঘটে। স্থায়ী ভাবগুলি যেমন রসে রূপান্তরিত হতে পারে, ব্যভিচারী ভাবগুলি তা পারেনা। তার কোন রস রূপ নেই। আলংকারিকগণ ৩৩ টি ব্যভিচারী ভাবের কথা বলেছেন। এগুলি হল নির্বেদ, আবেগ , দৈন্য , শ্রম , মদ , জড়তা , উগ্রতা , বিরোধ , স্বপ্ন , অপস্মার , গর্ব,মরণ , অলসতা , অমর্ষ , নিদ্রা , অবহিত্থা,ঔৎসুক্য ,উন্মাদ ,শঙ্কা , স্মৃতি ,মতি ,ব্যাধি, সন্ত্রাস,লজ্জা , হর্ষ , অসূয়া , বিষাদ , ধৃতি, চপলতা, গ্লানি, চিন্তা ও বিতর্ক।আলংকারিকগণ তেত্রিশটির মধ্যে ব্যভিচারী ভাবকে সীমিত রাখলেও এগুলোর সংখ্যা কখনোই ৩৩ হওয়া উচিত নয়। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে নানা রকম ভাবের জন্ম হচ্ছে, যা বহু যুগ আগে সংস্কৃত আলংকারিক কোন ভাবতে পারিনি। এমন সমস্ত ভাব মানুষের মনের জন্ম নেয় যা ৩৩ ভাবের থেকে আলাদা। অধ্যাপক সুধীর কুমার দাশগুপ্ত তাঁর ‘ কাব্যালোক’ গ্রন্থের আলংকারিক প্রদত্ত ৩৩ টি ব্যভিচারী ছাড়াও আরও ৩৩ টি ব্যভিচারীর কথা উল্লেখ করেছেন ।এগুলো হলো করুণা বা দয়া , উপেক্ষা , পবিত্রতা, প্রীতি, প্রমাদ , প্রসন্নতা ,ঈর্ষা , দম্ভ ,লোভ , নিন্দা ,মান ,অপমান, অভিমান, অনুতাপ,

ভক্তি , ছলনা , সহিষ্ণুতা , দম ,ত্যাগ ,শ্রদ্ধা , সন্তোষ ,ভ্রান্তি ,ছলনা, খলতা, কোমলতা, কঠিনতা , স্বাধীনতা , প্রগতি , বিদ্রূপ , বিদ্রহ , সাম্য ,সেবা , সমুন্নতি।আচার্য ভরত আলঙ্কারিকদের দ্বারা উল্লিখিত ৩৩ টি ব্যভিচারী ভাবকে 'রাজ অনুচর' বলেছিলেন এবং শারদাতনয় এগুলোকে সমুদ্র তরঙ্গ বলে উল্লেখ করেন। তরঙ্গ যেমন সমুদ্র থেকে উঠে সমুদ্রের বুকে মিলিয়ে গিয়ে স্থায়ীভাব প্রাপ্ত হয়, ব্যভিচারী ভাবগুলিও তেমন স্থায়ী ভাব থেকে উঠে সেখানেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। ঢেউ বিহীন সমুদ্রের অস্তিত্ব যেমন কল্পনা করা যায় না তেমনি ব্যভিচারীবিহীন স্থায়ীভাব অকল্পনীয়। ব্যভিচারী মূলভাবের রস পরিপুষ্টির সহায়ক।

এ পর্যন্ত আমরা যে চারটি উপাদান নিয়ে আলোচনা করলাম। সেগুলির মধ্যে স্থায়ীভাব ও সঞ্চারীভাব হলো মানসিক বা অন্তরঙ্গ উপাদান। বিভাব ও অনুভাব হল বহিরঙ্গের উপাদান।কারণ এই দুই উপাদান কাব্য জগত থেকে আসে। ভরত যে রস নিষ্পত্তির সূত্র দিয়েছেন তাতে বিভাব অনুভাব ব্যভিচারীভাবের সঙ্গে সংযোগের কথা

বললেও এই সংযোগ কার সঙ্গে কার উল্লেখ করেননি। স্পষ্ট বোঝা যায় যে স্থায়ীভাবে সঙ্গে এগুলি সংযোগে রস নিষ্পত্তি ঘটে। আচার্য বিশ্বনাথ তাই বলেছেন সামাজিকদের রতি স্থায়ীভাব বিভাব অনুভাব সঞ্চারীভাবে প্রকাশিত হয়ে রসরূপ লাভ করে। বিভাব অনুভাব ব্যভিচারী সংযোগে নিষ্পত্তির বিষয়টি বেশ জটিল। ভরত এর উল্লেখ করলেও উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। পরবর্তীকালে আচার্য ভট্টলোল্লট, ভট্টশঙ্কুক, ভট্টনায়ক রস নিষ্পত্তির ব্যাখ্যা দিতে সফল হন। তাদের উৎপত্তিবাদ, অনুমিতিবাদ, ভুক্তিবাদে রসনিস্পত্তি যথার্থভাবে ধরা পড়েনি। এ ব্যাপারে সকলকে পিছনে ফেলে যুক্তিপূর্ণ ও মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা করেছিলেন অভিনবগুপ্ত তার 'অভিব্যক্তিবাদ' এ। তার ব্যাখ্যা থেকে রসনিষ্পত্তির প্রসঙ্গটি আমাদের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু অভিনব গুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ এর আলোচনা আগে ভরত নিজে রসনিষ্পত্তির বিষয়টি নিয়ে কি বলেছেন তা জানা আবশ্যক।

ঙ) রস নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে আচার্য ভারত

আচার্য ভরত যদিও নাট্যরস প্রসঙ্গে রস নিষ্পত্তির সূত্রটি ব্যাখ্যা করেছিলেন, কিন্তু তার

আলোচনা থেকে বোঝা যায় কাব্য সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন না। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন "যেমন নানা রকম ব্যঞ্জন ঔষধি এবং দ্রব্যের সংযোগে ভোজ্য (রস) নিস্পন্ন হয়,জেমন গুড় প্রভৃতি দ্রব্য,ব্যঞ্জন ও ওষধির সাহায্যে ষাড়বাদি রস তৈরি হয়, ঠিক তেমনি নানাভাবের সংযোগে স্থায়ীভাব রসে পরিণত হয়। ভরতের ব্যাখ্যা অনুযায়ী নিস্পত্তি শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'নিস্পন্ন', 'তৈরি' অথবা 'স্বরূপত্ব' লাভ। সংযোগ শব্দের অর্থ স্পষ্ট করতে গিয়ে ভরত বলেছেন "নানা ব্যঞ্জন সহযোগে অন্ন ভোজনকারী জনগণ যেমন রস আস্বাদন করে আনন্দ লাভ করেন, তেমনি বিভিন্ন ভাব এবং আঙ্গিক বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা ব্যাঞ্জিত স্থায়ীভাবের আস্বাদন গ্রহণ করে সহৃদয় দর্শক আনন্দ প্রভৃতি লাভ করেন।" লৌকিক জীবন থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে সংযোগ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। আমরাও তাই সেই লৌকিক জীবনের দৃষ্টান্তকে আরেকটু সহজ করে ব্যাখ্যা করতে চাই। ধরা যাক আমাদের বাড়িতে অতিথি আমন্ত্রিত হয়েছেন। তাকে মধ্যাহ্নভোজনের আহবান করে কেবলমাত্র অন্ন দিয়া আপ্যায়ন করতে পারি না। তিনি খেয়ে যাতে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে তার জন্য আমরা পঞ্চ ব্যঞ্জনের আয়োজন করি। তাতে মাছ-মাংস দই-মিষ্টি তরিতরকারি সবই থাকে। তবে খেয়ে তিনি আনন্দ পান। অনুরূপভাবে নাটক দেখতে গিয়ে সহৃদয় দর্শকের স্থায়ী ভাবের আস্বাদন হয় হয় তা অন্য নিরপেক্ষ নয়। বিভিন্ন ভাব এবং আঙ্গিক বাচিক অভিনয় দর্শক আনন্দিত হন। ভরতের ব্যাখ্যা অনুযায়ী নাট্যরস হল ভোজ্য রস, স্থায়িভাব অন্ন এবং বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারী হল ব্যঞ্জন। সুতরাং বিভাব অনুভাব ব্যভিচারী ভাবের সঙ্গে স্থায়ী ভাবের সংযোগ বা সম্পর্ক স্থাপিত হলে রসসিদ্ধি ঘটে। এই 'সিদ্ধি' শব্দের অর্থ হলো উৎপত্তি বা নির্মিতি। নির্মিতি বলতে ভরত নিস্পত্তিকে বুঝিয়েছিলেন। সুতরাং রস নিস্পত্তি বলতে বোঝায় রসের উৎপত্তি।

চ) অভিনব গুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ

ভরত রস নিস্পত্তির সূত্রটি ব্যাখ্যা করলেও যার হাতে এই সূত্রটির চরম স্ফূর্তি ঘটেছিল তিনি হলেন টীকাকার অভিনবগুপ্ত। অভিনবগুপ্ত অভিব্যক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠা করেননি, তার পূর্ববর্তী টীকাকারের মতবাদকে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করেছেন। অভিনব গুপ্ত কেবল অভিব্যক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠা করেননি, তার পূর্ববর্তী টীকাকারের মতবাদকে

যুক্তিসহ খণ্ডন করেছিলেন। ‘ধ্বন্যালোকে’র লোচন টীকায় তিনি কাব্যের রসাভিব্যক্তির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হলো ‘শব্দ সমর্পমান হৃদয়সংবাদসুন্দরবিভাবানুভাব -সমুদিত - প্রাঙনিবিষ্টরত্যাদিবাসনানুরাগসুকুমার –স্বয়ংবিদানন্দ- চর্বনব্যপার- রসনীয়- রূপো রসঃ’ এর সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায় শব্দে সমর্পিত, হৃদয় সংবাদে সুন্দর বিভাব অনুভাবের দ্বারা পূর্ব থেকে মনের মধ্যে স্থিত রতি বাসনার অনুরঞ্জনে সুকুমার, নিজের চিত্তের আস্বাদের ব্যাপারের যে রসনিয়তা তাই হল রস। এই সূত্রটির রহস্য স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়লেও এর জটিলতাটি স্বীকার করতেই হয়। অর্থাৎ সূত্রটিকে টানা অর্থে গ্রহণ করলে বেশ বেগ পেতে হয়। তাই প্রতিটা অংশ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী তাঁর বিখ্যাত ‘অলংকার চন্দ্রিকা’ গ্রন্থে এর চমৎকার ব্যাখ্যা করেছিলেন। কাব্যের উপাদান হলো শব্দ। এই শব্দের উপাদান ব্যবহার করে কবি যথাযোগ্য রূপে তার স্থায়িভাবের বিভাব অনুভাব নির্মাণ করেন। পাঠক যখন এ কাব্য পাঠ করেন তখন প্রথমে শব্দের উপাদানে তৈরি বিভাব অনুভাবের অর্থ বোধ হয়। এরপর যদি পাঠক সহৃদয় ব্যক্তি হন, তবে এই বিভাব অনুভাবের অর্থ বোধ থেকে তার চিত্তে স্থায়িভাবের উদ্বোধন হয়। স্থায়ীভাবের উদ্বোধনের ফলে কাব্যের বিভাব অনুভাবচিত্তের বাসনাকে রঞ্জিত করে। এরপর সুন্দরভাবে রঞ্জিত বাসনা সহৃদয় পাঠকের আত্ম চইতন্যকে আনন্দময় করে তোলে।এই সংবিতের য

চর্বনা, তাই হল রস।

অভিনব গুপ্তের মতে রস উৎপন্ন বা অনুমিত হয় না। তা ব্যঞ্জিত বা অভিব্যক্ত হয়। বিশ্লেষণের পর আগের টীকাকারের বক্তব্য খণ্ডন করে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছান।

ছ) “কাব্যের জগৎ বস্তুর জগৎ নয়, মায়ার জগৎ- এ কথা সত্য, কিন্তু বস্তুনিরপেক্ষ মায়া হয় না; সুতরাং সম্পূর্ণ অবাস্তব কাব্য অসম্ভব”

“কাব্যের কথাবস্তু যদি ভাবের প্রাকৃত বস্তুর যথাযথ চিত্র না হয় তবে রসবোধের বাধা ঘটে।”

কাব্য জগতে অলৌকিক মায়ার জগৎ হলেও তা বস্তু নিরপেক্ষ নয়। কবি হলেন আমাদের মতই সামাজিক মানুষ। সুতরাং সমাজ ও পারিপার্শ্বিককে আশ্রয় করেই তার

ভাবনার জাগরণ ঘটে। যে অবস্থা বা পরিবেশের সঙ্গে কবি পরিচিত নন সেই অবস্থা বা পরিবেশকে নিয়ে তিনি যথার্থ কাব্য রচিত করতে পারেন না। যিনি কোনদিন রূপসী বাংলার সৌন্দর্য দেখেননি তার পক্ষে জীবনানন্দের মতো চিত্ররূপময় কবিতা লেখা সম্ভব নয়। আবার নগরকে ভালো করে না চিনে সমর সেনের মত নাগরিক কবি হওয়া মানায় না। পরিবেশ যেমন কবির কাব্য রচনায় প্রভাব ফেলে তেমনি আমাদের মনের মধ্যে উদ্ভূত নানাভাব কাব্য মূর্তি নিয়ে প্রকাশ পায়। কিন্তু মনে রাখা দরকার এ ভাব কোন নিরালম্ব জিনিস নয়।বস্তুকে আশ্রয় করেই ভাব জন্মায়। যে মানুষ লোকালয় থেকে বেরিয়ে একাকী নির্জন নিভৃত গুহায় বাস করে তাকে যদি বলা হয় প্রেমের কাব্য লিখতে সে নিতান্তই অপারগ হবে। তার কারণ নায়ক নায়িকার প্রেম যে দেখেনি তার মধ্যে রতিভাব জাগা সম্ভব নয়। সেজন্যই তো রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত বৈষ্ণব কবিতাতে প্রশ্ন তুলেছিলেন, বৈষ্ণব পদকর্তা এত প্রেমের কথা,রাধিকার চিত্তদীর্ণ এত ব্যাকুলতা কার আঁখি থেকে চুরি করে নিয়েছিলেন? তিনি বিশ্বাস করতেন মর্তের বাতায়ন বিলাসিনী কোন নায়িকার অস্তিত্ব কবিদের মনে যদি না থাকতো তবে কখনোই শ্রীরাধাকে তারা চিত্রিত করতে পারতেন না। সুতরাং বৈষ্ণব কবিতাতে রাধা কৃষ্ণের যে ছবি আছে তা আসলে লৌকিক জগতকে আশ্রয় করেই রচিত হয়েছে। তাত্ত্বিকরা যাই বলুক না কেন বৈষ্ণব কবিতায় চিত্রিত রাধা কৃষ্ণ প্রেমের একটা লৌকিক ভিত্তি আছে।

আমাদের মনের মধ্যে বিভিন্ন সময় যে বিভিন্ন ভাবগুলি জেগে উঠে তার পেছনে লৌকিক জগতের বহু কারণ থাকে। যেমন আমরা প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোক জাগে। আবার রাগে আমাদের চোখ লাল হয়ে যায়। তখন আমাদের মধ্যে ক্রোধভাব জেগেছে। মনে রাখা প্রয়োজন এই ভাব একান্তভাবেই লৌকিক জগতের বিষয়। তা কাব্য নয়। কিন্তু লৌকিক কারন যখন বিভাবের রূপ নেয় এবং আমাদের অন্তর্গত স্থায়ীভাব জাগ্রত করে ও তা যখন ব্যভিচারী দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে সহৃদয়ের আনন্দের কারণ হয় তখনই তাকে কাব্য বলে। স্থায়িভাবের জাগরণ বস্তুনিরপেক্ষ ভাবে ঘটে না। জগতের কারণ ও কার্য না থাকলে বিভাব অনুভাবের জন্ম হতে পারতো না। সে ক্ষেত্রে কাব্য সৃষ্টির প্রসঙ্গটি অবান্তর হয়ে যেত।

মন্তব্য

বাল্মিকীর শোক ভাব থেকে জাত শ্লোকের কথা ভাবা যাক। বাস্তব জগতের মিলনরত ক্রৌঞ্চের নিষাদ কর্তৃক বান বিদ্ধ হওয়ার চিত্র দেখেছিলেন। এই ঘটনায় তিনি শোকার্ত হলেন অর্থাৎ তার অন্তরে শোকভাব জাগল।

কিন্তু এই লোক তো আর কাব্য নয়। যখন লৌকিক শোকের কারণগুলো বিভাব অনুভাব এর মধ্য দিয়ে অলৌকিক হয়ে উঠলো তখনই তা কাব্য হল। তিনি শোক থেকে শ্লোক রচনা করলেন।

২.৬ অনুশীলনী

১।কাব্যের জগত অলৌকিক মায়ার জগত –ব্যাখ্যা করো।

২।"কাব্যের কথাবস্তু যদি ভাবের প্রাকৃত বস্তুর যথাযথ চিত্র না হয় তবে রসবোধের বাধা ঘটে।" আলোচনা করো।

৩।অভিনব গুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ কি?

৪।বিভাব অনুভাব ব্যাভিচারিসংযোগাদ রসনিষ্পত্তির সুত্রটি ব্যাখ্যা করো।

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১।ধ্বন্যালোক- সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত

২। কাব্যলোক- সুধীর কুমার চক্রবর্তী

৩। কাব্য জিজ্ঞাসা- অতুলচন্দ্র গুপ্ত

৪।কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা - অচিন্ত্য বিশ্বাস

৫।ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব - অবন্তীকুমার সান্যাল

একক ৩ - ধ্বনিবাদ

বিন্যাসক্রম

৩.১ ধ্বনিবাদ ও শব্দার্থশক্তি

৩.২ ধ্বনিরাত্ম কাব্যস্য

৩.৩ বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের তুলনামূলক আলোচনা

৩.৪ ধ্বনির শ্রেণী বিভাগ

৩.৫ অনুশীলনী

৩.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ ধ্বনিবাদ ও শব্দার্থশক্তি

এক তলার থেকে আর এক তলায় উঠতে গেলে সিঁড়ি ভাঙতে হয়। আমরা ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে একটা একটা সিঁড়ি পেরিয়ে উঠে যাই ওপরে। কাব্যের রহস্য আবিষ্কার অনেকটা সিঁড়ি ভাঙার মত।কাব্যের রহস্য আবিষ্কার অনেকটা সিঁড়ি ভাঙার মতো। সংস্কৃত আলংকারিকগণ একদিনে এই কাব্যরস সাগরের সন্ধান পাননি। বেশ কয়েক ধাপ অতিক্রম করে তারা পৌঁছেছিলেন কাব্যের কাঙ্খিত জগতে। তার সন্ধানে অবতীর্ণ হয়ে আমরা বেশ কয়েকটা সিঁড়ি পেরিয়ে এসেছি দেহাত্মবাদ, অলংকারবাদ ইত্যাদি। সংস্কৃত আলংকারিক এই সিঁড়ির নাম দিয়েছেন ধ্বনিবাদ। তা আসলে কি, কবে,কার হাতে প্রথমে জন্ম সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোন প্রমান আমাদের হাতে নেই। এই নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আচার্য আনন্দবর্ধন ও তার বিখ্যাত ধ্বন্যালোক গ্রন্থের কথা

আমাদের প্রথমেই মনে আসে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাদ এর উদ্ভাবক ছিলেন না, এমন কোন দাবিও আনন্দবর্ধন কখনো করেননি। তিনি ছিলেন তার সঙ্কলক। এর জন্যে তার কৃতিত্বকে খাটো করে দেখার কোন মানে হয়না। এই তত্ত্বের বিচ্ছিন্ন ও বিলুপ্ত সূত্রগুলো এতদিন ছড়ানো-ছিটানো ছিল। আনন্দবর্ধন সেগুলিকে একত্রিত করে ধ্বনির আলোকে আমাদের আলোকিত করেছেন । ধ্বনিবাদ এমন জোরালো মতবাদ ছিল যে এর প্রভাবে অলংকারবাদ ও রীতিবাদের প্রাধান্য নষ্ট হয়ে যায়। ধ্বনিবাদ এর বিস্তৃত আঙিনায় অলংকার ,গুণ , রীতি এসব কিছু জায়গা করে নেয়। এমনকি ধ্বনিবাদ এর পরবর্তী রসবাদও তার বিরোধিতা করে না। ধ্বনিবাদ রসবাদের পরিপূরক হয় আলংকারিকদের দৃষ্টি ধ্বনিবাদের প্রতি খুব বেশি মাত্রায় পড়েছিল ।

‘ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য’ সংস্কৃত আলঙ্কারিক প্রদত্ত এই সূত্রটি ব্যাখ্যা করার আগে ভূমিকা হিসাবে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। ধ্বনির স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের সঙ্গে পরিচয় প্রয়োজন।

এটি ‘শব্দার্থ শক্তি’। শব্দের ইষ্টক দিয়ে নির্মিত হয় কাব্য। শব্দ দিয়ে কাব্য শরীর গড়ে ওঠে বলে শব্দ দিয়েই আমরা কাব্যকে ছুঁই। তাই যে কোন কাব্য রসিকেরই শব্দার্থশক্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা জরুরি।

আনন্দবর্ধন ও অন্যান্য আলকেরিকগণ ব্যাকরণের পদ্ধতি অনুসরণ করে শব্দের চার রকম শক্তির কথা বলেছেন। এগুলি হল (১) অভিধাশক্তি (২) লক্ষণাশক্তি (৩) তাৎপর্যশক্তি (৪) ব্যঞ্জনাশক্তি

১। অবিধাশক্তি - যে শক্তি বলে একটি নির্দিষ্ট শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থকে বোঝায় তাকে অবিধাশক্তি বলে। এটিকে শব্দের প্রচলিত অর্থ বলা যেতে পারে। যেমন আমি যদি বলি ‘বৃদ্ধ’ তাহলে বয়সের ভারে নুয়ে পড়া একজন পরিণত বয়স্ক মানুষের কথাই বোঝাবে। বৃদ্ধ বললে আমাদের মনে অল্পবয়স্ক কোন শিশু কিংবা কিশোরের কথা মনে আসবে না। শব্দ ও অর্থের জ্ঞান আগে থেকে না থাকলে অবিধা শক্তির দ্বারা

সাংকেতিক মুখ্য অর্থের ধারনা করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ যে কোনো দিন বুড়োমানুষ দেখেনি তার কাছে যদি বৃদ্ধ শব্দের অর্থ জানতে চাওয়া হয় তার মনে পরিণত বয়স্ক একটি মানুষের কথা কখনই আসবে না। শব্দের সঙ্গে অর্থের যে অবিচ্ছিন্ন যোগ আছে সেটি মানুষের মনে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই কারণেই গাঁদা ফুল বললে আমরা সাদা কোন ফুল ভাবি না কিংবা "গাড়ি " বললে "বাড়ি' ভাবি না। অভিধাশক্তির দ্বারা সাংকেতিক অর্থকে অর্থাৎ মুখ্য অর্থকে অভিধেয় অর্থ, বাচ্যার্থ বা শব্দার্থ বলে।

২। **লক্ষণাশক্তি** - যে শক্তির বলে একটি শব্দ মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ বা অভিধেয়ার্থ ছাড়া মুখ্যার্থের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত আর একটি অর্থকে বুঝিয়ে থাকে, তাকে লক্ষণা বলে। শব্দের অভিধেয় অর্থ বা মুখ্যার্থ যদি বাক্য বা বাক্যাংশের অর্থ পরিস্ফুটনে অক্ষম হয় তাহলে আমরা লক্ষণার অনুগামী হই। 'জীবনানন্দ ভালো করে না পড়লে পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না'- এখানে মুখ্যার্থ ধরে যদি সমগ্র বাক্যটির অর্থ করতে যাওয়া হয় তাহলে এটির অর্থ ঠিক বোঝা যাবে না। জীবনানন্দ ছিলেন একজন মানুষ। তাকে ভালো করে পাঠ করা সম্ভব নয়। এখানে ব্যক্তি জীবনানন্দকে পাঠ করার কথা বলা হয়নি, তার সাহিত্যকর্মকে বোঝানো হয়েছে। এখানে মুখ্যার্থ গ্রহণে বাধা আছে বলেই আমরা একটি গৌণ অর্থ ধরে বাক্যটির অর্থ করলাম। মখন অভিধাশক্তি শব্দের মুখ্যার্থকে বুঝতে বাধা দেয় তখন যে শক্তির সাহায্যে আমরা অভিধা, বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট শব্দটির প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারি তাকেই বলে লক্ষণাশক্তি। এই শক্তির দ্বারা আমরা যে গৌণ অর্থকে বুঝে থাকি তাকে লক্ষ্যার্থ বলে।

এই লক্ষণাকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে (১) রাঢ়ি লক্ষণা (২) প্রয়োজন লক্ষণা। 'রাঢ়ি" শব্দের অর্থ হল লোকপ্রসিদ্ধি। যেমন 'অসভ্য চীন অসভ্য জাপান তারাও স্বাধীন তারাও মহান'। এই কাব্য পংক্তিটির মুখ্যার্থ ধরে যদি অর্থ করতে যাওয়া হয় তাহলে আমাদের অর্থ বুঝতে অসুবিধা হবে। একটা দেশ কখনো অসভ্য, স্বাধীন কিংবা মহান হতে পারে না। এখানে উনি চীন জাপান বলতে ভৌগোলিক ভূখন্ড

কে বোঝানো হয়নি। চীন ও জাপান দেশের মানুষকে বোঝানো হয়েছে। চীন জাপানবাসীকে বোঝাতে উল্লিখিত পংক্তিতে শুধু “চীন ও জাপান" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

অনুরূপ ভাবে যদি বলা হয়, “আমি নজরুল পড়তে ভালোবাসি” তবে নজরুল বলতে নজরুলের রচিত সাহিত্যকেই বোঝাবে। এই উদাহরণ গুলির সবই, লোক ব্যবহারে প্রসিদ্ধ বলে এগুলি রাঢ়ি লক্ষণার উদাহরণ। এখানে চীন, জাপান ও নজরুল হল লক্ষক ; আর চীন ও জাপানবাসী এবং নজরুলের সাহিত্য হল লক্ষ্য। উদাহরণ গুলিকে “রাঢ়ি” বলার কারণ এগুলি লোক ব্যবহারে পরিচিত। নজরুল' শব্দটি নিয়ে যখন আমরা কাজ চালাতে পারি এবং

লোকে যখন তা বোঝে তখন আর আমরা অনর্থক নজরুলের রচিত সাহিত্য বা কাব্য- এমন ভাবে বিস্তারিত বলি না।

প্রয়োজন লক্ষণাই হল প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ লক্ষণা। রাঢ়ি লক্ষণা অপেক্ষা তা অনেক উন্নত স্তরের। যেখানে লক্ষণার মূলে কোনো প্রয়োজন থাকে তাকে প্রয়োজন লক্ষণা বলে। এটি আসলে কি তা ব্যাখ্যাযোগ্য। যেমন

“এমন মানবজমিন রইল পতিত।

আবাদ করলে ফলত সোনা”

এখানে সোনার অর্থ মূল পংক্তিটির সঙ্গে সংগতি বিধায়ক নয়। তাই শব্দটিকে মুখ্যার্থে গ্রহণ করতে অসুবিধা হয়। ‘সোনাকে গৌণ অর্থে অর্থাৎ ‘ঐশ্বর্য’, ‘সমৃদ্ধি’ ইত্যাদি অর্থে গ্রহণ করলে পংক্তিটির মধ্যে অর্থ সঙ্গতি রচিত হয়। অর্থ-সংগতির পাশাপাশি অর্থের ব্যপ্তি ও বৈচিত্র্যও ঘটে। ‘ ঐশ্বর্য’ অ ‘সমৃদ্ধি’ কে বোঝানোর জন্য 'সোনা' শব্দটির ব্যবহার খুবই উপযুক্ত হয়েছে। কিন্তু আমি নজরুল পড়তে ভালোবাসি'— এই উদাহরণে নজরুল শব্দটি কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ করেনি। ‘আমি নজরুলের সাহিত্য পড়তে ভালোবাসি' বললেও কোনা ক্ষতি ছিল না। কিন্তু সোনা' শব্দটিকে কবি রামপ্রসাদ যে ভাবে প্রয়োগ করেছেন তাতে ছিল জীবনকে ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধময় করে তোলার অর্থটি সুন্দর ফুটেছে। প্রকাশের প্রয়োজনেই সোনা শব্দের প্রয়োগ করা

হয়েছে। আমাদের তাই মনে হয় সোনা শব্দটি ছাড়া ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধিকে যেন বোঝানোই যেতো না। সোনা শব্দের সূত্র ধরে আমরা যে ঐশ্বর্য সমৃদ্ধি ইত্যাদি সুক্ষ্ম গোপন অর্থের ইঙ্গিত পেলাম তাকে লক্ষণামূলক ধ্বনি বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

প্রয়োজন লক্ষণার আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ।

“বুকের মধ্যে বাঘ নিয়ে ঘুমিয়েছি কতকাল

এবার জেগেছে সে চরম প্রহরে।"

বুকের মধ্যে কোনো মানুষ বাঘ নিয়ে ঘুমোতে পারে না। তাই মুখ্যার্থে ‘বাঘ” শব্দটিকে গ্রহণ করা যায় না। মুখ্যার্থ এখানে বাধিত। সুতরাং বাঘ বলতে এখানে অন্য কিছু বোঝানো হয়েছে। সেটা হিংস্রতা, প্রতিহিংসা, বিদ্রোহী মনোভাব—এরকম অনেক কিছু হতে পারে। আগের উদাহরণটির মত এটিতেও যেহেতু সূক্ষ্ম গোপন অর্থের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাই এখানেও লক্ষণামূলকধ্বনি হয়েছে। গোপন সৌন্দর্য লাভের এই অভিপ্রায়কে অভিনব গুপ্ত ‘প্রয়োজন' বলেছেন। রাঢ়ি লক্ষণায় যেহেতু আমাদের সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না তাই রাঢ়ি লক্ষণা প্রয়োজন লক্ষণার মত উন্নত নয়। রাঢ়ি এবং প্রয়োজন—উভয় লক্ষণাতেই মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থের সঙ্গে লক্ষার্থের একটি সম্বন্ধ থাকে। তবে রূঢ়ি লক্ষণায় লক্ষ্যার্থের সঙ্গে বাচ্যার্থের সম্বন্ধ অনেক বেশি স্থুল। গোপন সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষমতা তার নেই। রাঢ়ি লক্ষণা মুখ্যার্থকে ছাড়িয়ে লক্ষ্যার্থের দিকে খুব বেশি দূর যেতে পারে না বলে তার থেকে গভীরতর কোনো অর্থ আবিস্কৃত হয় না। অন্য দিকে প্রয়োজন লক্ষণার গভীরতা অনেক বেশি বলে তা গোপনতম সৌন্দর্য আবিষ্কারে সক্ষম হয়। কাব্য যেহেতু দেহের উপরিতল থেকে আত্মার দিকে পাঠককে টেনে নিয়ে যায় তাই কাব্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজন লক্ষণার গুরুত্ব অনেক বেশি।

৩। তাৎপর্য শক্তি - ব্যঞ্জনাবাদীদের অনেকেই তাৎপর্য শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও অভিনব গুপ্তের আলোচনায় তাৎপর্য শক্তির বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। আমরা সকলে জানি যে বহু শব্দ পাশাপাশি বসে একটি বাক্য গঠন করে। বাক্যের অর্ন্তগত প্রতিটি শব্দের পৃথক পথক অর্থ থাকে। আবার পাশাপাশি কয়েকটি শব্দ বাক্যের মধ্যে

অন্বিত হলে সামগ্রিক একটি অর্থ প্রকাশ করে। পাশাপাশি কয়েকটি শব্দ একত্রে মিলিত হয়ে অন্বয়বোধের দ্বারা যদি একটি অখন্ড অর্থকে প্রকাশ করে তবে তাকে তাৎপর্য শক্তি বলে। শব্দের চেয়ে বাক্যের অর্থই যেহেতু তাৎপর্য শক্তিতে গুরুত্ব পায় তাই সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত তার 'কাব্য বিচার' গ্রন্থে তাৎপর্য শক্তি কে 'বাক্যশক্তি' বলে অভিহিত করেছেন। যেমন 'আমি' 'ভাত' ও 'খাই' এই তিনটি শব্দের পৃথক পৃথক ভাবে একটি করে অর্থ আছে। কিন্তু এই তিনটি শব্দ যখন পাশাপাশি বসে একটি সামগ্রিক অর্থ প্রকাশ করে তখন বিচ্ছিন্ন শব্দ গুলির তুলনায় বাক্যটির অর্থ তাৎপর্যগত ভাবে কিছটা আলাদা হয়ে যায়। এই সামগ্রিক বা অখন্ড অর্থটিকে তাৎপর্য বলা যেতে পাবে।

কাব্যও সমীক্ষা শব্দের যে তিন শক্তি নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করা গেল সেগুলি ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠার আগেই স্থির হয়ে ছিল। কিন্তু ধ্বনিবাদীরা আলোচনায় অবতীর্ণ হয়ে দেখালেন যে এই তিন শক্তি আসলে বাচ্যার্থকেই প্রকাশ করে। সার্থক কাব্য রাচার্থকে অতিক্রম করে - গভীরতর অর্থের প্রকাশ ঘটায় এই তিন শক্তির সাহায্যে তাকে পাওয়া যায় না। ধ্বনিবাদিদের মতে এই তিন শক্তির কাব্য সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষমতা নেই ।অভিধা শক্তির দ্বারা লভ্য অর্থ সবচেয়ে আগে ফুরিয়ে যায়। লক্ষণা শক্তি শব্দের অর্থকে আরও কিছুদূর সম্প্রসারিত করে ঠিকই কিন্তু তারও একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। অনুরূপ ভাবে তাৎপর্য শক্তির ক্ষমতাও খুবই সীমিত। কিন্তু শব্দের এমন একটি শক্তি

আছে যার ক্ষমতা অসীম । একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পর তা থেমে যায় না। তা শব্দ ও অর্থের সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে অনেক অনেক বেশি অর্থ প্রকাশে সক্ষম। এই শক্তিকে সংস্কৃত আলংকারিকগণ "ব্যঞ্জনা' নামে অভিহিত করেছেন। ব্যঞ্জনাশক্তির পরিমাপ করা যায় না— "ব্যাঞ্জনং ন তুলাধৃতম"। যে কোন কাব্যে এই ব্যঞ্জনা শক্তিরই প্রাধান্য।

৪।**ব্যঞ্জনা শক্তি** - যেখানে কাব্যের বাচ্যার্থ কোনো রকম বাধা না পেয়ে নিজ স্বরূপে প্রকাশিত। হয় অথচ বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে পাঠক পাঠিকার মনে একই সময়ে

আরও একটি অর্থ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই অর্থটিকে বলা হয় ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা। আর যে শক্তির সাহায্যে এই ধ্বনির অর্থকে পাওয়া যায় তাকে ব্যঞ্জনাশক্তি বা ব্যঙ্গ্যশক্তি বলে। ধ্বনি থেকে আমরা যে অর্থ লাভ করি তাকে ব্যঙ্গ্যার্থ বা প্রতীয়মানার্থ বলে। ধ্বনি থেকে প্রাপ্ত অর্থটিকে আমরা ঘন্টাধ্বনির অনুরণনের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। একটি ঘণ্টা বেজে উঠেই তার কাজ শেষ করে না। দীর্ঘক্ষণ ধরে অনুরণনের মাধ্যমে তার ক্রিয়া চলতে থাকে। ঠিক সে রকমই সার্থক কবিতা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে সহৃদয় পাঠকদের চিত্তে যে বাচ্যার্থের বোধ জন্মায় তা-ই তাকে নিয়ে যায় বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে অনেক দুরে। এই সূত্রে পাঠকদের চিত্তে নুতন একটি অর্থের সূক্ষ্ম-স্পন্দন অনুভূত হতে থাকে। এই নূতন অর্থটি হল ব্যঙ্গ্যার্থ বা প্রতীয়মানার্থ। ধ্বন্যালোক গ্রন্থে প্রতীয়মান অর্থ' কে নারীদেহের লাবণ্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

নারীদেহের লাবণ্য দেহ কে আশ্রয় করে থাকলেও যেমন দেহকে ছাপিয়ে ওঠে, ঠিক সেই রকমই মহাকবিদের বাণীতে এমন একটি বস্তু থাকে যা কাব্যশরীরকে আশ্রয় করে থেকেও তাকে অতিক্রম করে যায়। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব কাব্য' থেকে একটি চির পরিচিত উদাহরণ দিয়ে ধ্বনির স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অঙ্গিরা হিমালয়ের কাছে মহাদেবের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এলে কালিদাস লিখেছেন –

এবংবাদিনি দেবর্যৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।

লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী।।

এর সুন্দর বঙ্গানুবাদ করেছেন অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী

"দেবর্ষি যবে কহিলা একথা।

পিতার পার্শ্বে পার্বতী নতাননী।

হেরিতে লাগিল লীলাকমলের

দলগুলি গণি গণি।"

এই অংশটির কাব্যত্ব নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন তুলবে না। কোন অলংকারের সুষমায় এই কাব্যত্ব নয়, কারণ সে রকম কোনো অলংকারই এখানে নেই। ধনিবাদীরা এর কাব্যত্ব লীলাকমলের পত্রগণনার মধ্যে লক্ষ্য করেছেন। কারণ তা বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে সহৃদয় পাঠককে অর্থান্তরে নিয়ে যায় এবং তার থেকে পূর্বরাগের লজ্জার ব্যঞ্জনা উৎসারিত হয়। অঙ্গিরা বিবাহ-প্রস্তাবে পার্বতীর মনে রতি (প্রেম) উদ্দীপিত হয়েছে। এই উদ্দীপিত রতি স্বাভাবিক ফল হল হর্ষ, যা অবশ্যম্ভাবী ভাবে চোখ মুখে প্রকাশিত হওয়ার কথা। কিন্তু এই হর্ষজনিত বিকার প্রকাশিত হওয়ার আগেই সামনে গুরুজন থাকায় তার লজ্জা এসেছে। লজ্জা তার 'অবহিথা ' নামক গৌণ বাসনা কে জাগিয়ে দেয়। অবহিথা সঞ্চারী বা ব্যভিচারী হলেও ভাব। কিন্তু এই 'ভাৰ যে জেগেছে তা বোঝা যায় পার্বতীর নতুন বিকারে বা আচরণে। যার প্রমাণ আছে মুখ অবনত করায় ও লীলাপলের পত্র গণনায়। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে কবি

এখানে ব্যঞ্জনায় যে বক্তব্যটি উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন তা সরাসরি ভাবে না বলে কিছুটা ইঙ্গিতে বলেছেন। এই ইঙ্গিতটুকু উপলব্ধি করতে না পারলে, আমরা এর প্রতীয়মান অর্থটিক বুঝতে পারবো না। ইংরাজীতে একেই বলে 'Suggested Sense' এই ইঙ্গিতের অভাব ঘটলে, অথাৎ Flat করে কোনো বক্তব্য উপস্থাপিত হলে, তা আর যাই হোক প্রথম শ্রেণীর কাব্য হবে না। কালিদাসের শ্লোকটিকেই যদি আবরণ না দিয়ে সরাসরি বলা হত-

"বরের কথায় উমার হল পুলকের উদগম

নত মুখে লজ্জা পেয়ে বলল কথা কম।"

তবে তার কাব্যমহিমা অনেকাংশে ক্ষুন্ন হত।

রবীন্দ্রনাথ তার 'মদনভস্মের পর' কবিতায় লিখেছিলেন-

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী!

বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে ।

ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে ওঠে নিশ্বাসি

অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।

এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এর বক্তব্য বাচ্যকে ছাড়িয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে মানবমনের চিরন্তন বিরহ, যা মিলনের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে তারই ইঙ্গিত করেছেন এবং সেখানেই এর কাব্যত্ব।

এবারে আধুনিক কবি জয় গোস্বামীর 'মাসিপিসি' কবিতাটি নেওয়া যাক :

ফুল ছুঁয়ে যায় চোখের পাতায় জল ছুঁয়ে যায় ঠোটে

ঘুম পাড়ানী মাসিপিসি রাত থাকতে ওঠে।

শুকতারাটি ছাদের ধারে, চাঁদ থামে তালগাছে

ঘুম পাড়ানী মাসিপিসি ছাড়া কাপড় কাচে

দু- এক ফোঁটা শিশির তাকায় ঘাসের থেকে ঘাসে

ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি ট্রেন ধরতে আসে।

ঘুম পাড়ানী মাসিপিসির মস্ত পরিবার

অনেকগুলো পেট বাড়িতে, একমুঠো রোজগার

ঘুম পাড়ানী মাসিপিসির পোটলা পুটলি কোথায়?

রেল বাজারের হোমগার্ডরা সাত ঝামেলা জোটায়

সাল মাহিনার হিসাব তো নেই জষ্টি কি বৈশাখ

মাসিপিসির কোলে কাঁখে চালের বস্তা থাক

শতবর্ষ এগিয়ে আসে – শতবর্ষ যায়।

চাল তোলো গো মাসিপিসি লালগোলা বনগাঁয়।

এই কবিতায় বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে উঠেছে তার ব্যঞ্জনা। ব্যাচ্যার্থে মাসিপিসিদের চালের ব্যবসার কথা বলা হলেও ব্যঞ্জনায় যুগ যুগ ধরে অনাহারী সংগ্রামী মানুষ গুলোর

পরিবর্তনহীন অবস্থার কথা বলা হয়েছে। সভ্যতার বদল ঘটে, সময় এগিয়ে চলে, শতবর্ষ পার করে নতুন শতবর্ষের সূচনা হয় কিন্তু অনাহারী, অর্ধাহারী, সংগ্রামী মানুষ গুলোর জীবনের ট্র্যাজেডির বদল ঘটে না। এক বৈচিত্র্যহীন বেঁচে থাকাকে সঙ্গী করে তাদের জীবন কাটে। যে কোনো সার্থক কবিতার মত এখানেও ব্যাচ্যার্থকে আশ্রয় করে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু তা বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে গেছে। এখন পর্যন্ত আমরা কয়েকটি উদাহরণ সহযোগে কবিতার ব্যাঙ্গার্থ আসলে কি তা বোঝাতে সচেষ্ট হয়েছি। তবে মনে রাখা দরকার যে কেবল শব্দার্থের জ্ঞান থাকলেই কবিতার ব্যাচ্যার্থকে ঝেঝা যাবে না।

আবার ব্যঙ্গ্য অর্থ বুঝতে গেলে ব্যাচ্যার্থের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া দরকার। কারণ সহৃদয় পাঠকের মনে যে ব্যাঙ্গ্যার্থের জন্ম নেয় তা বাচ্যার্থের পথ বয়েই। যেমন উপযুক্ত আলো পেতে গেলে প্রদীপ শিখার ব্যাপারে যত্নশীল হতে হয় তেমনি ব্যাচ্যার্থের ব্যাপারে যত্নশীল না হলে ব্যাঙ্গার্থের প্রতীতি জন্মায় না। প্রদীপ শিখা কম্পিত হলে উপযুক্ত আলো লাভ করা যায় না, অনুরূপভাবে বাচ্যার্থের প্রতীতি না জন্মালে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি জন্মায় না। সন্তান যেমন মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নিয়ে স্ব-প্রতিভার গুণে তাকেই আচ্ছন্ন করে দিতে পারে তেমনি ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থের মধ্যে থেকে উদ্ভূত হয়ে বাচ্যার্থকে গৌণ করে দেয়।

৩.২ ধ্বনিরাত্ম কাব্যস্য

- "যা শ্রেষ্ট কাব্য তার প্রকৃতিই হচ্ছে বাচ্যকে ছাড়িয়ে যাওয়া"
- "শ্রেষ্ঠ কাব্য নিজের বাচ্যার্থে পরিসমাপ্ত না হয়ে বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা করে"

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠা একদিনে হয়নি। কাব্যের শব্দার্থ, অলংকার ইত্যাদির আলোচনা বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা বিপর্যস্থ হলে ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। বস্তুবাদী আলংকারিকগণ তাদের আলোচনায় ধ্বনির

অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান নি। কাব্য যে তার বাচ্যকে ছাড়িয়ে কথার অতীতলোকে পাঠককে নিয়ে যায়, এ ধরনের

কথাবার্তা তাদের কাছে হেঁয়ালি বলে মনে হয়েছে। কাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে তারা বার বার ঘুরপাক খেয়েছে বাচ্য, গুণ, অলংকার ইত্যাদির জগতে। ধ্বনিবাদীরা যে ধ্বনিকে অপুর্ব বস্তু বলে উল্লেখ করেছেন, বস্তুবাদীরা তাকেই খুঁজে পেয়েছেন কাব্যের শোভা, গুণ, অলঙ্কারের মধ্যে। এ সবের অতিরিক্ত ধ্বনি বলে কিছু নেই বলেই তাদের বিশ্বাস ছিল।

ধ্বনির লক্ষণ বিচার করতে গিয়ে ধ্বনিবাদীর ভূমিকা হিসাবে কাব্যের দুটি অর্থের কথা বলেছেন- (১) বাচ্য অর্থ (২) প্রতীয়মান অর্থ। বাচ্য অর্থ বলতে কি বোঝায় সে আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। কিন্তু মহাকবিদের বাণীতে বাচ্য অর্থের অতীত আর এক অর্থ থাকে, যাকে প্রতীয়মান অর্থ বা ব্যাঙ্গার্থ বলা হয়। এ অনেকটা রমণীদেহের লাবণ্যের মত। নারীদেহের লাবণ্য যেমন দেহকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেও দেহকে ছাপিয়ে যায়, তেমনি মহাকবিদের বাণীতে এমন কিছু থাকে যা কথার অতীতলোকে পাঠককে নিয়ে যায়। পৃথকভাবে প্রতীত এই প্রতীয়মান অর্থটির সন্ধান সহৃদয় পাঠক ছাড়া অন্য কেউ পায় না।। এর সঙ্গে কাব্যের ব্যবহৃত শব্দ, গুণ কিংবা অলংকারের কোনো সম্পর্কই নেই। এবারে একটি উদাহরণ দিয়ে ধ্বনির স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

আনন্দবর্ধন একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন –

“শ্রম ধার্মিক বিশ্রব্ধঃ স শুনকোহদ্য মারিতৃস্তেন।

গোদাবরীনদীকূললতাগহনবাসিনা দৃপ্তসিংহেন"।

এর বঙ্গানুবাদ করা হয়েছিল

“ভ্রমণ কর গো ধার্মিক তুমি

গোদাবরী তীরে কুঞ্জবনে –

ভয় পেতে সেই কুকুর নিহত

দৃপ্ত সিংহ এসেছে বনে।"

এই উদাহরণে ধ্বনি কোথায় লুকিয়ে আছে সেটি জানার জন্যে ঘটনাটির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কোনো নায়িকার প্রিয়মিলন কুঞ্জে এক তপস্বী এসে সর্বদা পত্রপুষ্প ছিড়ে স্থানটির শোভা নষ্ট করত। তপস্বীর আগমন জনিত কারণে মিলনস্থানটির গোপনীয়তাও ব্যাহত হত। নায়িকা সাধুটির এ কাজ পছন্দ না করলেও একদিন তাকে গোদাবরী তীরে কুঞ্জবনে ভ্রমণ করতে বলল এবং তাকে আরও জানালো, যে কুকুরটাকে সে ভয় পেত সেই কুকরটা

নদীতীরে আগত একটি ভয়ঙ্কর সিংহের দ্বারা নিহত হয়েছে। এখানে বুদ্ধিমতী প্রেমিকা ইঙ্গিতধর্মী কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে নিজ কার্য সিদ্ধ করেছে। এখানে বাচ্যবস্তু হল ‘ ভ্রমন কর গো’ —এই বিধি। কিন্তু ব্যঞ্জনায় যে বস্তু পাওয়া যায় তা হল নিষেধ। অর্থাৎ সাধু যে কুকুরটিকে ভয় পেত সেটি নিহত হয়েছে ঠিকই কিন্তু তার জায়গায় এসে হাজির হয়েছে ভয়ঙ্কর এক সিংহ। সুতরাং সাধুর পক্ষে বনে গমন নিরাপদ হবে না। এই উদাহরণটির বাচ্যার্থ হল যেটা প্রতীয়মানাথ ঠিক তার বিপরীত। এখানে বিধির মধ্যে দিয়ে নিষেধের ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে এটি একটি শ্রেষ্ঠ ধ্বনির উদাহরণ।

এ রকম বাচ্যার্থের নিষেধ থেকে ব্যঙ্গ্যার্থে বিধির প্রতীতিও হতে পারে।

"শ্বশ্রূরত্র শেতে অথবা নিমজ্জিত অত্রাহং দিবসকে প্রলোকয়।

না পাথিক রাত্রান্ধঃ শয্যারামাবয়োর্ম মংক্ষীঃ।।

এর বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে।

ওগো রাত কানা প্রিয় –

যেথা শশুড়ী ঘুমান বা ঘুমে অচেতন সেই ঠাঁই দেখে নিও।

আমি কোনখানে ঘুমাই ভুলো না – মনে রাখা তব চাই,

রাত্রিতে ভুলে শুয়ো নাকো কভু আমার এ বিছানায়।”

এই শ্লোকের অর্থ হল, কোনো প্রোষিতভর্তৃকা নারীকে দেখে সেখানে আগত এক পথিকের কামোদয় হয়। তখন নারীটি পথিককে জানায় যে তার শাশুড়ী কোনখানে

অবচেতনভাবে নিদ্রা যায় এবং সেই বা কোনখানে নিদ্রা যায়। রাতকানা পথিক যেন তাদের ঘাড়ে গিয়ে না পড়ে। এখানে বাচ্যার্থ পথিককে নিষেধ করা হলেও ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ত প্রতীয়মান অর্থে নারীটি পথিককে তার শয্যায় আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এখানে বাচ্য অর্থের ঠিক বিপরীত অর্থ প্রতীয়মান অর্থ থেকে লাভ করা যায়। তাই এটিও একটি প্রথম শ্রেণীর ধ্বনির উদাহরণ।

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'যখন বৃষ্টি নামলো' নামে একটি বিখ্যাত কবিতা আছে। এই কবিতার শেষ স্তবকটি নেওয়া যাক।

বৃষ্টি নামলো যখন আমি উঠোন পানে একা।

দৌড়ে গিয়ে ভেবেছিলাম তোমার পাবো দেখা

হয়তো মেঘে বৃষ্টিতে বা শিউলি গাছের তলে।

আজানুকেশ ভিজিয়ে নিচ্ছো আকাশ ছেচাঁ জলে

কিন্তু তুমি নেই বাহিরে – অন্তরে মেঘ করে।

ভারি ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরে।

আপাত সরল এই কবিতাটির মধ্যে লুকিয়ে আছে গভীরতর ব্যঞ্জনা। বাচ্যার্থের সিঁড়ি বেয়েই আমাদের পৌঁছাতে হয় সেই ব্যঞ্জনার জগতে। উদ্ধৃত অংশটির প্রথম চার পংক্তিতে যে বাচ্যার্থ আছে তার অর্থ উপলব্ধিতে পাঠকের কষ্ট হয় না। কিন্তু বাধা পেতে হয় শেষের দুই পংক্তিতে এসে। এখানে আর আক্ষরিক অর্থে পংক্তি দুটিকে গ্রহণ করা চলে না। অন্তর, আকাশ নয়, তাই সেখানে মেঘ ঘনিয়ে উঠতে পারে না। আর সেই মেঘ থেকে জলও ঝরে পড়ে না। সুতরাং কবির চিত্রকল্প রচনার উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল তা সহৃদয় পাঠকমাত্রই বুঝতে পারে। সেই প্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় কবির ব্যর সঙ্গে বিরহের। সম্পর্ক গেথে তুলেছেন। বর্ষার আগমণের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় মিলনের আকাক্ষা বাড়ে। আর এই আকাঙক্ষা পূরণ না হলেই জাগে বিরহ। বিরহ ও বিচ্ছেদের যন্ত্রনাতেই অন্তরের আকাশে কালোমেঘ ঘনিয়ে আসে, আর সেখান থেকে ঝরে পড়ে ভারি ব্যাপক বৃষ্টি, যা আসলে লবণাক্ত অশ্য ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই

ভাবে মেঘ ও বৃষ্টির সূত্রে ব্যঞ্জনায় পাঠক উপলব্ধি করে 'অবরুদ্ধ আবেগ' ও 'অশ্রু বারিধারা' কে। এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত কবিতাটি বিরহের অতলে পৌঁছে দেয় পাঠককে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাংশটি প্রথম শ্রেণীর ধ্বনির উদাহরণ। এখানে অলংকারের ব্যবহার খুব কম। এটি সার্থক কাব্য হয়েছে ব্যঞ্জনা ও ধ্বনির গুণে।

ব্যবহারিক জগতের ভাষা প্রয়োজনের কোঠায় বন্দী। আমরা ভাব-বিনিময়ের জন্য ভাষা ব্যবহার করি—যাকে অন্য অর্থে কমিউনিকেশন বলা যেতে পারে। কাব্যের উদ্দেশ্যও কমিউনিকেশ বা সঞ্চার। তবে প্রয়োনের কমিউনিকেশন

নয়, কাব্যে আমরা আইডিয়ার কমিউনিকেশন চাই। এই আইডিয়া শ্রেষ্ঠ কাব্যে কখনই সরাসরি ব্যক্ত হয় না, তা সংকেতিত বা ব্যঞ্জিত হয়। যেমন ব্যাঞ্জিত হয়েছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাতে। কবিতার মধ্যে এই ব্যাঞ্জনাটুকু না থাকলে তা যেমন শ্রেষ্ঠ কাব্য হত না, তেমনি ধ্বনিকেও আমরা কাব্যের আত্মা বলতে পারতাম না।

- বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য প্রধান কবিতার মধ্যে পার্থক্য

আমরা একাধিক উদাহরণ দিয়ে ধ্বনির স্বরূপ তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি এবং ধ্বনির যে বাচ্য, অলংকার, গুণ, রীতি— এ সবের থেকে আলাদা বস্তু কয়েকটি উদাহরণ সহযোগে তারও প্রমাণ রেখেছি, কিন্তু বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য প্রধান কবিতার তুলনামূলক আলোচনা না করলে ধ্বনির স্বরূপটি ঠিক বোঝা যায় না। আলোচনার এই অসম্পূর্ণতা দূর করার জন্যই আমরা বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য প্রধান কবিতার আলোচনায় ব্রতী হয়েছি। মনে রাখা দরকার যে কোনো কবির পক্ষেই তার জীবনের সকল রচনা শ্রেষ্ঠ করে তোলা সম্ভব নয়। এমন কি রবীন্দ্রনাথের মত মহৎ কবির অনেক রচনাও রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি। কল্পনা ও আবেগের যে গভীরতম প্রদেশ থেকে সার্থক কবিতা উৎসারিত হয়, সেই কল্পনার সর্বোচ্চ স্তরে মহৎ কবিও সবসময় পৌঁছাতে পারেন না। এর ফলে ব্যঞ্জনাধর্মী কবিতা সবসময় রচিত

হয় না। তবু এরই মধ্যে এমন কিছু কিছু সৃষ্টি সম্ভব হয় যা কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে বেঁচে থাকে। আমরা উদাহরণ দিয়ে তা প্রমাণ করতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাংলা সাহিত্যের দুই দিকপাল কবি। দু-জনেই "হাট' বলে দুটি কবিতা রচনা করেছেন। একই বিষয় নিয়ে রচিত হয়েও দুটি কবিতা যে কতটা আলাদা হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ 'হাট' কবিতা দুটি। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হাট' কবিতাটি উদ্ধার করা যাক।

কুমোর পাড়ার গোরুর গাড়ি

বোঝাই করা কলসি-হাঁড়ি।

গাড়ি চালায় বংশীবদন,

সঙ্গে যে যায় ভাগ্নে মদন।

হাট বসেছে শুক্রবারে।

বক্সিগঞ্জে পদ্মাপারে।

জিনিসপত্র জুটিয়ে এনে।

গ্রামের মানুষ বেচে কেনে।

উচ্ছে বেগুন পটল মূলো।

বেতের বোনা ধামা কুলো,

সর্ষে ছোলা ময়দা আটা,

শীতের র‍্যাপার নক্সা-কাটা,

ঝাঁঝরি কড়া বেড়ি হাতা,

শহর থেকে সস্তা ছাতা।

কলসী ভরা এখো গুড়ে।

মাছি যত বেড়ায় উড়ে।

খড়ের আঁটি নৌকো বেয়ে

আনল ঘাটে চাষীর মেয়ে।

অন্ধ কানাই পথের পরে

গান শুনিয়ে ভিক্ষে করে।

পাড়ার ছেলে স্নানের ঘাটে

জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটে।

এবারে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'হাট' কবিতা

দূরে দূরে গ্রাম দশবারো খানি।

মাঝে একখানি হাট

সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ।

প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট।

বেচা-কেনা সেরে বিকাল বেলায়

যে যাহার সবে ঘরে ফিরে যায়।

বকের পাখায় আলোক লুকায়

ছাড়িয়া পুবের মাঠ।

দূরে দূরে গ্রামে জ্বলে ওঠে দীপ –

আঁধারেতে থাকে হাট।

নিশা নামে দূরে শ্রেণীহারা একা

ক্লান্ত কাকের পাখে

নদীর বাতাস ছাড়ে প্রশ্বাস।

পার্শ্বে পাকুড় শাখে।

হাটের দোচালা মুদিল নয়ান

কারো তরে তার নাই আহ্বান,

বাজে বায়ু আসি বিদ্রূপ বাঁশী

জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে।

নির্জন হাটে রাত্রি নামিল

একক কাকের ডাকে।

দিবসেতে সেথা কত কোলাহল

চেনা-অচেনার ভিড়ে ;

কতল ছিন্ন চরণ চিহ্ন

ছড়ান সে ঠাঁই ঘিরে।

মাল চানাচিনি দর জানাজানি

কানাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি।

হানাহানি করে কেউ নিল ভরে,

কেউ গেল খালি ফিরে।

দিবসে থাকে না কথার অন্ত

চেনা-অচেনার ভিড়ে !

কত কে আসিল, কত না আসিছে

কত না আসিবে হেথা

ওপারের লোক নামালে পসরা

শিশির বিমল প্রভাতের ফল,

শত হাতে সহি পরখের ছল –

বিকাল বেলায় বিকায় হেলায়

সহিয়া নীরব ব্যথা।

হিসাব নাহিরে - এল আর গেল

কত ক্রেতা বিক্রেতা !

নুতন করিয়া বসা আয় ভাঙা

পুরানো হাটের মেলা;

দিৱস রাত্রি নতুন যাত্রী

নিত্য নাটের খেলা।

খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে

বাধা নাই ওগো – যে যায় যে আসে,

কেহ কাঁদে, কেহ গাঁটে কড়ি বাধে

ঘরে ফিরিবার বেলা।

উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে

চিরকাল একই খেলা!

দুটি কবিতার বিষয় একই কিন্তু ভাবগত দিক থেকে উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। রবীন্দ্রনাথ তার কবিতাটিতে গ্রামের হাটের একটি শব্দচিত্র রচনা করেছেন। আর পাঠক মূলত শিশুরা। বর্ণনা অনুপুঙ্খতা ও পারিবেশিক খুটিনাটির জন্য সহজেই তা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাট ব্যাচার্থে এসেই থেমে যায়।

পরিবেশিক অনুপুঙ্খতা ছাড়া এই কবিতা থেকে পাঠকের আর বিশেষ কোনো প্রাপ্তি থাকে না। বর্ণনার গুণে রবীন্দ্রনাথ গ্রামের হাটের পরিমণ্ডলটিকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হলেও তাঁর রচনা বিষয়ান্তরে নিয়ে যায় না। অথচ যতীন্দ্রনাথের 'হাট' কবিতায় বেচাকেনার গ্রাম্য হাটটি গৌণ হয়ে গিয়ে সংসারের ও জীবনের হাটখানি মুখ্য হয়ে ওঠে। একদা শেক্সপীয়র পৃথিবীটাকে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে এবং তার মানুষদের অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। যতীন্দ্রনাথের কাছে এই পৃথিবীটা একটি 'হাট' রূপে কল্পিত হয়েছে। হাটে যেমন প্রবেশাধিকারের বাধা নেই, তেমনি সংসার রূপ হাটের দ্বার সকলের জানা খোলা আছে। প্রত্যেকেই এই বিশ্বসংসারে আসে লাভের কড়ি গুণে নিতে সাফল্যের মুখ দেখতে। সাফল্য এসে গেলে তারা গাঁটে কড়ি বাঁধে, আর যারা তা পারে না, হতাশা তাদের সঙ্গী হয়। এই ভাবে আমরা দেখি যতীন্দ্রনাথের 'হাট' কবিতায় যে বাচ্যার্থ হাটের বর্ণনা আছে তা ক্রমশ গৌণ হয়ে গিয়ে ব্যঞ্জনায় জীবনের হাটটি মুখ্য হয়ে ওঠে। কল্পনার যাদুতে বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে চলে যান ঊর্ধ্ব লোকে। আর সে কারণেই যতীন্দ্রনাথের হাট মহৎ সৃষ্টি হয়ে ওঠে।

৩.৩ বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের তুলনামূলক আলোচনা

বাচ্যার্থ ও বাঙ্গ্যার্থের তুলনামূলক আলোচনাকে আমরা সূত্রকারে লিপিবদ্ধ করতে পারি।

প্রথমত : আনন্দবর্ধন প্রভৃতি আলংকারিকদের আলোচনা থেকে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে কাব্যকে ধ্বনিগত দিক থেকে বিচার করলে বাচ্যার্থ অনেকাংশে গৌণ হয়ে পড়ে এবং মুখ্য স্থান দখল করে ব্যাঙ্গার্থ।

দ্বিতীয়ত : বাচ্যার্থের তুলনায় ব্যাঙ্গার্থ অনেক বেশি মনোহারী।

তৃতীয়ত : বাচ্যার্থের বিধি ব্যঙ্গ্যার্থে নিষেধ রূপে প্রতিভাত হতে পারে, আবার বাচ্যার্থের নিষেধ নিয়ে ব্যঙ্গ্যার্থের বিধি রূপ ধারণ করতে পারে ।

চতুর্থত: বাচ্যার্থ অনেকের দ্বারা একই ভাবে গৃহীত হলেও ব্যঙ্গ্যার্থ সকলের দ্বারা একই ভাবে গৃহীত নাও হতে পারে। বাচ্যার্থ সংকেতের ওপর নির্ভরশীল বলে তার স্বরূপ মোটামুটি এক। কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ যেহেতু সহৃদয়ের সংস্কারের ওপর নির্ভরশীল তাই ব্যক্তিভেদে তার পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ একই কাব্য পাঠ করে সকল সহৃদয় পাঠক যে একই ব্যঙ্গ্যার্থে গিয়ে পৌছাবে এমন কোনো কথা নেই। সহৃদয় ভেদে সংস্কার ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে বাঙ্গ্যার্থ বদলে যায়।

পঞ্চমত : বাচ্যার্থের প্রতীতির কারণ শব্দজ্ঞান, অর্থন ও ব্যাকরণ ডন কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতির কারণ সহৃদয়তা বা সহৃদয় সামাজিকের ভাবয়িত্রী প্রতিভা।

ষষ্ঠত : বাচ্যার্থ কেবলমাত্র বোধ উৎপন্ন করে, অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকাশ ঘটায়, কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে চমৎকৃতিও সঞ্চারিত করে।

৩.৪ ধ্বনির শ্রেণী বিভাগ

আনন্দবর্ধন কেবল কাব্যে ধ্বনির গুরুত্ব নিরূপণ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি ধ্বনির শ্রেণীবিভাগও করেছিলেন। তিনি ধ্বনিকে মূলত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন (১) অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনি এবং (২) বিবক্ষিতন্যপর বাচ্যধ্বনি।

১) অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনি - যেখানে বাচ্যার্থ একে বারেই উচ্ছিষ্ট নয় কিংবা যেখানে বাচ্যার্থ থেকে একেবারে তার বিপরীত অর্থের অবগতি হয় তাকে অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনি বলে। এ জাতীয় ধ্বনিতে কবির উক্তিটি বাচ্য অর্থে পাঠক গ্রহণ করুক এটা কবি চান না। কবি এখানে শব্দ প্রয়োগ করেন লাক্ষণিকভাবে বিশেষ সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়োজনে। পাঠক লক্ষণার প্রয়োজনাটি অর্থাৎ গোপন সৌন্দর্যটি ব্যঞ্জনায় আবিষ্কার করে আনন্দ পান, এটাই থাকে কবি অভিপ্রায়।

এই অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনি দু রকমের ক) অর্থান্তরসংক্রমিত খ) অতন্ত্য-তিরস্কৃত

ক) অর্থান্তরসংক্রমিত – অর্থান্তরসংক্রমিত ধ্বনিতে বাচ্য অর্থ তার নিজের অর্থটি বজায় রেখে অন্য অর্থে প্রবেশ করে। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এখানে বাচ্যার্থ লক্ষক হয়ে ওঠে। অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী ' গান্ধারীর আবেদন' থেকে এই ধ্বনির একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন ।

'নাহি জানে

জাগিয়াছে দুর্যোধন। মূঢ় ভাগ্যহীন,

ঘনায়ে এসেছে আজি তোদের দুর্দিন।'

দুর্যোধন কথাটার বাচ্যার্থ হল ধৃতরাষ্ট্রপুত্র। আর এখানে তোদের মানে হল প্রজাদের । এই তোদের অর্থাৎ প্রজাদের অপরাধ, তারা পাণ্ডবদের অনুরাগী। আজ বন গমনোদ্যত পান্ডবদের দেখবার জন্যে তারা পথে পথে "দীনবেশে সজল নয়নে" প্রতীক্ষা করছে। কবির 'দুর্যোধন' ধৃতরাষ্ট্র পুত্ররূপ বাচ্যার্থটি বজায় রেখে যে নতুন অর্থের দ্যোতনা করতে যাচ্ছে, তার প্রথম পদক্ষেপ লক্ষণায়—"মূঢ় ভাগ্যহীন, ঘনায়ে এসেছে আজি তোর দুর্দিন।" এ পর্যন্ত প্রজাদের ওপর প্রতিশোধ বাক্যটি বলিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ প্রয়োজনে একটি নতুন চারিত্রিক ধর্মে দুর্যোধনকে সংকীর্ণ করে এনেছেন। এ শুধু ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন নয়, প্রতিশোধস্পৃহ দুর্যোধন। এখানে এসে লক্ষণার কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু কবি এখানে এই কথাটির থেকে অন্য একটি অর্থে যেতে চেয়েছেন, সেটি হল, প্রতিশোধ

নেওয়া দুর্যোধনের পক্ষেই সম্ভব। কারণ পাণ্ডবদের নির্বাসন তারই হীনতম চক্রান্তের ফল। সে কুটিল, হিংসা পরায়ণ, ক্ষমতালিপু, ষড়যন্ত্রকারী, পাণ্ডব-বিদ্বেষী এবং আরও কত কি। এখানে দুর্যোধন 'ধৃতরাষ্ট্রপুত্র' এই বাচ্যার্থটিই কবির একমাত্র অভিপ্রেত নয়, অথচ সেটিকে আচ্ছন্ন না করে কবি এখানে দুর্যোধন সম্পর্কে নানা মুর্তির ব্যঞ্জনা দিয়েছেন। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে ধ্বনি এখানে অর্থান্তরে সংক্রমিত হয়ে গেছে। তাই এটি অর্থান্তর সংক্রমিত ধ্বনির উদাহরণ।

খ) অতন্ত্য-তিরস্কৃত বাচ্য ধ্বনি- যেখানে বাচ্যার্থ নিজ অর্থকে অত্যন্ত তিরস্কৃত অর্থাৎ দুরীভূত করে একেবারে বিপরীত অর্থ বোঝায় কিংবা নতুন অর্থের পথ ইঙ্গিত করে সরে পড়ে সেখানে অত্যন্ত-তিরস্কৃত বাচ্যধ্বনি হয়। মম্মট এই ধ্বনির একটা চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন।

"উপকৃতং বহুতত্র কিমুচ্যতে, সুজনতা প্রথিতা ভবতা চিরং।

বিদধদীদশমেব সদা সখে সুখিতমাসস্ব ততঃ শারদাং শতম।"

কোনও অপকারী ব্যক্তির প্রতি কেউ বলছে যে, আপনি বহু উপকার করেছেন ও বহু সৌজন্য দেখিয়েছেন—এরকম সৌজন্য দেখিয়ে আপনি একশো বছর বেঁচে থাকুন। কিন্তু বক্তার উদ্দেশ্য এখানে সম্পূর্ণ উল্টো—আপনি

চিরকাল ধরে বহু অপকার করেছেন ও বহু অসৌজন্য দেখিয়েছেন—সম্ভব হলে আপনার আজই মৃত্যু হোক। এখানে বাচ্যার্থ অত্যন্ত তিরস্কৃত হয়ে বিপরীত অর্থকে বুঝিয়েছে বলে অত্যন্ত-তিরস্কৃত বাচ্যধ্বনি হয়েছে।

এই ধ্বনির দৃষ্টান্তও দেওয়া যায় যেখানে দেখা যায় বাচ্যার্থ নতুন অর্থের পথ ইঙ্গিত করে সরে পড়েছে। অধ্যাপক অবন্তী কুমার সান্যাল একটি প্রাকৃত শ্লোকের মুক্তানুবাদের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করেছেন।

আকাশ ছেয়েছে মত্ত মেঘেরা, বনে

অর্জুন শাখা দোলায় বৃষ্টিধারা,

ঘুচে গেছে সব চাঁদের অহংকারও

কালো কালো রাত তবু হৃদয়হরা।"

এখানে "মত্ত" এবং "অহংকার" শব্দদুটিতে ধ্বনি লুকিয়ে আছে। মেঘ জড় পদার্থ, তাই তা মত্ত হতে পারে না। অনুরূপ ভাবে চাঁদের অহংকার থাকতে পারে না। এই দুটিকে বাচ্যার্থে গ্রহণ করা অসম্ভব। কিন্তু মত্ত বা মাতালের সাদৃশে মেঘের অসংযম ও দুনিবাররূপ বর্জিত হচ্ছে। চাঁদের অহংকার ঘুচে গেছে বলায় চাঁদের মালিন্য,

শোভাহীনতা ও উজ্জ্বলতার অভাব ধ্বনিত হয়েছে। এখানে “মত্ত” ও “অহংকার” দুটি শব্দের বাচ্যার্থ অত্যন্ত তিরস্কৃত। তাই এটি অত্যন্ত-তিরস্কৃত ধ্বনির উদাহরণ।

২) বিবক্ষিতন্যপরবাচ্যধ্বনি – বিবক্ষিতন্যপধ্বনির মূলে থাকে অভিধা। বিবক্ষিত ও 'অন্যপর' শব্দ দুটি ‘বাচ্য’ এর বিশেষণ বলে এই ধ্বনিকে বিবক্ষিতন্যপর বাচ্যধ্বনি বলে। অবিবক্ষিত ধ্বনিতে বাচ্য অর্থটি কবির অভিপ্রেত নয়, কিন্তু এখানে তার বিপরীত। অর্থাৎ বাচ্যার্থটিও এখানে বিবক্ষিত বা অভিপ্রেত। এর তাৎপর্য হল এই যে এখানে বাচ্য আপনাকে বজায় রেখে ব্যঙ্গ্য অর্থকে প্রকাশ করে এবং এই ব্যঙ্গ্যার্থটিই হয় মুখ্য। এখানে বাচ্য অর্থটি বাচ্য হয়ে থেকেও আর একটি অর্থকে অনুরণন ক্রমে ব্যঞ্জিত করে তাকে প্রধান করে তাোলে। বলে এটি প্রকৃত ধ্বনিকাব্যের বিষয়।

এই ধ্বনি আবার দু-প্রকারের (ক) সংলক্ষ্যক্রম, (খ) অসংলক্ষ্যক্রম।

ক) সংলক্ষ্যক্রম বা লক্ষ্যক্রম ধ্বনি —বাচ্য অর্থের সম্পূর্ণ বোধ না হলে ব্যঙ্গ্য অর্থের সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মায় না। বাচ্যার্থের বোধ থেকে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতির মধ্যে ক্রম বা পর্যায় অর্থাৎ আগে ও পরের ব্যাপার সব সময়েই থাকে। যেখানে বাচ্যার্থ থেকে ব্যাঙ্গ্যার্থ উদ্ভবের ক্রমটি লক্ষ্য করা যায় বা স্পষ্ট বলে মনে হয় সেখানে সংলক্ষ্যক্রম বা লক্ষ্যক্রম ধ্বনি হয়।

খ) অসংলক্ষ্যক্রম ৰা অলক্ষ্যক্রমধ্বনি — যেখানে বাচ্যার্থ থেকে ব্যঙ্গ্যার্থে উদ্ভবের ক্রমটি জল করা যায় না, বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ একই কালে প্রকাশিত বলে মনে হয় সেখানে অসংলম বা অলক্ষ্যক্রম ধনি হয়। একটি পদ্মফুলে সুচি

বিধিয়ে দিলে পদ্মের পাঁপড়িগুলি শরণঃ করে গেলেও খুব দ্রুততার কারণে ক্রমটি লক্ষ্যগোচর হয় না, অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি তেমন। পেট্রোলে আগুন ছোঁয়ালে তা দপ করে জ্বলে ওঠে কিংবা ব্লটিং পেপারে কালি ফেললে নিমেয়ের মধ্যে শুষে নিয়ে যেমন কাগজটি ভিজে ওঠে, তেমনি অসংলক্ষক্রম ধ্বনিতেও ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছে।

সংলক্ষ্যক্রম ও অসংলক্ষক্রম ধ্বনি দু প্রকার। সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনির দুটি বিভাগ হল বস্তুধ্বনি ও অলংকার ধ্বনি। এবং অসংলক্ষক্রম ধ্বনির বিভাগ দুটি হল ভাবধ্বনি ও রসধ্বনি।

বস্তুধ্বনি - যেখানে বাচ্যার্থ থেকে একটি বস্তু ব্যঞ্জিত হয় এবং তা বাচ্যার্থ অপেক্ষা অধিক মনোহারী হয়ে প্রধান হয়, সেখানে বস্তুধ্বনি হয়। বস্তুধ্বনি যেহেতু সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি তাই বাচ্যার্থ থেকে ধ্বনিত বা ব্যঞ্জিত ক্রমটি স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। বস্তুধ্বনির উদাহরণ দু-রকমের হতে পারে -- ১) বস্তু থেকে বস্তু ২) অলংকার থেকে বস্তু।

বস্তু থেকে বস্তু -

ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'মাইকেল' কবিতার বিখ্যাত পংক্তিটিও আমরা নিতে পারি।

"And never lifted up a single stone "

এই পংক্তিটি বাচ্যার্থ অতি তুচ্ছ এবং তা এমন কিছু মনোহর নয়। কিন্তু এর সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে এর ব্যাঙ্গার্থের

মধ্যে। বৃদ্ধ কৃষক যখন তার একমাত্র পুত্রকে হারালো তখন তার হৃদয়ের বেদনা ও দুঃখের তীব্রতা বোঝাতে পংক্তিটি ব্যবহৃত হয়েছে। বাচ্যার্থে যা ছিল পাথর তোলার মত অকিঞ্চিৎকর একটি প্রসঙ্গ তাই ই ব্যাঙ্গার্থে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বেদনায় চমৎকারিত্ব লাভ করেছে।

অলংকার থেকে বস্তু

অযোধ্যার প্রাসাদভবনে

রাম দূর্বাদলশ্যাম লভিলেন জন্ম যেই ক্ষণে,

লঙ্কেশকিরীট হতে নিপতিত মাণিক্যের ছলে

স্বর্ণালঙ্কারাজলক্ষ্মী-অশ্রুবিন্দু ঝরিল ভূতলে।।

—শ্যামাপদ চক্রবর্তী।

‘মাণিক্যের ছলে অশ্রুবিন্দু ঝরিল’ হল অপহ্নতি অলংকার। এই অলংকারের দ্বারা ধ্বনিত হয়েছে ‘অদূর ভবিষ্যতে

রাবণরাজ্যের ধবংস’ বস্তুটি। এখানে যে অপহ্নতি অলংকার আছে সেটি প্রকাশ করার কোনো অভিপ্রায় কবির ছিল না। তাই এ অলংকারটিকে গৌণ করে প্রধান হয়ে উঠেছে অদূর ভবিষ্যতে রাবণরাজ্যের ধ্বংসরূপ বস্তুটি। সুতরাং এটি অলংকার থেকে বস্তুধ্বনির উদাহরণ।

অলংকার ধ্বনি –

যেখানে বাচ্যবস্তু বা অলংকার গৌণ বা অপ্রধান হয়ে অন্য অলংকারের ব্যঞ্জনা আনে সেখানে অলংকার ধ্বনি হয়। বস্তুধ্বনির মত অলংকার ধ্বনির উদাহরণ দু রকম হয়।

১) বস্তু থেকে অলংকার ২) অলংকার থেকে অলংকার।

বস্তু থেকে অলংকার

বরফি মিঠে, জিলাবি মিঠে, মিঠে শোনপাপড়ি

তাহার অধিক মিঠে, কন্যা, কোমল হাতের চাপড়ি।

এই উদাহরণটিতে বরফি, জিলাবি ও শোনপাপড়ির মিষ্টত্বের কথা বলা হয়েছে; কিন্তু এগুলির চেয়েও মিষ্টি হল কন্যার কোমল হাতের চাপড়ি (চড়)। এখানে বরফি, জিলাতি ও শোনপাপড়ি হল উপমান এবং কন্যার হাতের চাপড়ি হল উপমেয়। উপমানের চেয়ে উপমেয়ের উৎকর্ষ দেখানো হয়েছে বলে এটি উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক অলংকার। বরফি, জিলাবি এবং শোনপাপড়িই হল বস্তু। এই বস্তু বা বাচ্যার্থ থেকে অনুরণন ক্রমে ধ্বনিত হয়েছে কন্যার হাতের চাপড়ির উৎকর্ষ। সুতরাং এটি বস্তু থেকে অলংকারধ্বনির উদাহরণ।

অলংকার থেকে অলংকার

“চিরদিন ছিল সাধ – কল্পতরু হেরিব নয়নে;

সে সাধ পূরিল মোর আজিকে তোমার দরশনে"

(চিত্রমীমাংসা থেকে)—শ্যামাপদ চক্রবর্তী

উদাহরণটি বিশেষ অলংকারের। বিনা আধারে যদি আধেয় বস্তু থাকে তবে বিশেষ অলংকার হয়। এখানে আধার হল স্বর্গের নন্দনবন এবং আধেয় হল কল্পতরু। নন্দনবন না থাকা সত্ত্বেও বক্তা এখানে কল্পতরু দেখছেন। আবার 'কল্পতরু' ও 'তুমি'র মধ্যে অভেদ কল্পিত হওয়ায় রূপক অলংকার হয়েছে। অর্থাৎ বিশেষ অলংকার ব্যঞ্জিত করেছে তুমিই কল্পতরু – এই রূপক ধ্বনি। এখানে একটি অলংকার আর একটি অলংকারকে ব্যঞ্জিত করেছে বলে এটি অলংকার থেকে অলংকার ধ্বনির উদাহরণ।

ভাব ধ্বনি

সংস্কৃত আলংকারিকগণ নয়টি স্থায়িভাব ছাড়াও তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাবের কথা বলেছেন। এই ব্যভিচারী ভাব কখনো কখনো অত্যন্ত পুষ্টি হয়ে বলে প্রাধান্য লাভ করে ও স্বয়ং আস্বাদ্য হয়ে ওঠে এবং তখনই তা ভাবধ্বনি রূপে গণ্য হয়। ভাবধ্বনি অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনির পর্যায় ভুক্ত। ভাবধ্বনির উদাহরণ দিতে গিয়ে অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী তার 'অলংকার চন্দ্রিকা' গ্রন্থে 'কুমারসম্ভবের' একটি বিখ্যাত শ্লোক বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন ।

"দেবর্ষি যবে কহিলা একথা ।

পিতার পার্শ্বে পার্বতী নতননী।

হেরিতে লাগিল লীলাকমলের

দলগুলি গণি গণি।"

এই অংশটির কাব্যত্ব নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন তুলবে না। কোন অলংকারের সুষমায় এই কাব্যত্ব নয়, কারণ সে রকম কোনো অলংকারই এখানে নেই। ধনিবাদীরা এর কাব্যত্ব লীলাকমলের পত্রগণনার মধ্যে লক্ষ্য করেছেন। কারণ তা বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে সহৃদয় পাঠককে অর্থান্তরে নিয়ে যায় এবং তার থেকে পূর্বরাগের লজ্জার ব্যঞ্জনা

উৎসারিত হয়। অঙ্গিরা বিবাহ-প্রস্তাবে পার্বতীর মনে রতি (প্রেম) উদ্দীপিত হয়েছে। এই উদ্দীপিত রতি স্বাভাবিক ফল হল হর্ষ, যা অবশ্যম্ভাবী ভাবে চোখ মুখে প্রকাশিত হওয়ার কথা। কিন্তু এই হর্ষজনিত বিকার প্রকাশিত হওয়ার

আগেই সামনে গুরুজন থাকায় তার লজ্জা এসেছে। লজ্জা তার 'অবহিথা ' নামক গৌণ বাসনা কে জাগিয়ে দেয়। অবহিথা সঞ্চারী বা ব্যভিচারী হলেও ভাব। কিন্তু এই 'ভাৰ যে জেগেছে তা বোঝা যায় পার্বতীর নতুন বিকারে বা আচরণে। যার প্রমাণ আছে মুখ অবনত করায় ও লীলাপলের পত্র গণনায়। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে কবি এখানে ব্যঞ্জনায় যে বক্তব্যটি উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন তা সরাসরি ভাবে না বলে কিছুটা ইঙ্গিতে বলেছেন। এই ইঙ্গিতটুকু উপলব্ধি করতে না পারলে, আমরা এর প্রতীয়মান অর্থটিক বুঝতে পারবো না। বিভাব অনুভাবের অভাবে শৃঙ্গার এখানে পূর্ণতা পায়নি। ব্যভিচারী পূর্ণতা পেয়েছে তার বিভাব অনুভাব থাকার জন্যে।ভাবের আস্বাদ এখানে অতিপ্রত্যক্ষ এবং রসের আস্বাদ অতি পরোক্ষ তাই এটি ভাবধ্বনির সার্থক উদাহরণ।

রসধ্বনি

- **"রসের ব্যঞ্জনাই বাক্যকে কাব্য করে। *কাব্যের ধ্বনি* হচ্ছে রসের ধবনি "।**
- **"রস ধ্বনিই *শ্রেষ্ঠ ধ্বনি।*"**
- রস যেখানে বাচ্যের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রধান বা অঙ্গীরূপে ধ্বনিত হয়, সেখানে রসধ্বনি হয়। আচার্য আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত রসধ্বনিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্বনি বলতে চেয়েছেন। আনন্দবর্ধন 'ধবন্যালোক' গ্রন্থে কাব্যের সত্যকার আত্মা রস বললেও 'রসধ্বনি' কথাটি ব্যবহার করেন নি। এটি প্রথম ব্যবহার করেন আচার্য অভিনবগুপ্ত। অভিনব গুপ্ত বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি ও ভাবধ্বনির সঙ্গে রসের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে প্রথম তিনটিকে প্রাণের সঙ্গে তুলনা করলেও একমাত্র চতুর্থটিকেই আত্মা বলেছেন। রসধ্বনির শ্রেষ্ঠত্ব একাধিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

মন্তব্য

১। আনন্দবর্ধন বস্তুধ্বনি ও অলংকার ধ্বনি নিয়ে যে মূল্যবান আলোচনা করেছেন, তার থেকে বোঝা যায় যে, রসাস্বাদ ও ভাবাস্বাদ ছাড়াও বস্তু এবং অলংকারও আস্বাদ্য হতে পারে, যদি তারা ধ্বনিত হয়। কিন্তু বস্তু বা অলংকারের ধ্বনিত হওয়া বাধ্যতামূলক নয় বাচ্যর্থে বোধ্য বস্তু বা অলংকার যদি ধ্বনিত হয়, তবেই তা চারুত্ব লাভ করে । কিন্তু রসের চারুত্ব নিয়ে কোন প্রশ্নই আসে না, কারণ তাকে ধ্বনিত হতেই হয়। সুতরাং একটির

ক্ষেত্রে ধ্বনিত হওয়া বাধ্যতামূলক নয়, অথচ অপরটির ক্ষেত্রে ধ্বনিত হওয়া বাধ্যতামূলক। এই ধ্বনিত হওয়া

প্রসঙ্গে বস্তু ও অলংকার ধ্বনির চেয়ে রসধ্বনি অনেকটা এগিয়ে আছে।

২। অভিনগুপ্ত বস্তু ও অলংকার ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলতে অস্বীকার করেছেন। তার মতে ধ্বনির তিনরকম ভেদ কারিকাকার করেননি, করেছিলেন বৃত্তিকার আনন্দবর্ধন। কারিকাকার ‘সেই অর্থ’ অর্থাৎ প্রতীয়মান অর্থ এবং ধ্বনিত অর্থকেই কাব্যাত্মা বলেছেন। অভিনব গুপ্ত ' সেই অর্থ’ বা প্রতীয়মান অর্থকে বলেছেন রসার্থ বা রস ধ্বনি।

৩। ধ্বনিকে বস্তু ও অলংকারে ভাগ করা হলেও বস্তু ও অলংকার ধ্বনি সব সময় রসেই পর্যবসিত হয়; তাই রসধ্বনিই শ্রেষ্ঠ।

৪। ভাবধ্বনি প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, এই ধ্বনিতে ব্যভিচারীভাব অত্যন্ত পুষ্ট হয়ে চমৎকারিত্ব লাভ করে। কিন্তু ভাব ধ্বনির নিজস্ব চমৎকারিত্ব যতই থাক, তবু তা রসের মুখাপেক্ষী। স্থায়িভাব যদি হয় সমুদ্র তবে ব্যভিচারী তার ঢেউ। সমুদ্রকে বৈচিত্র্যদান যেমন ঢেউয়ের ধর্ম তেমনি স্থায়িভাবকে বৈচিত্র্য দান ব্যভিচারীর ধর্ম। স্থায়ি তাই মুখ্য, ব্যভিচারী গৌণ। রসধ্বনিতে স্থায়িভাবগুলিই রসে পর্যাবসান লাভ করে, ব্যভিচারী স্থায়ির সঙ্গে থেকে কেবল বৈচিত্র্য বিধান করে। যেহেতু ব্যভিচারী বা সঞ্চারীর কোনো স্বতন্ত্র রসমূর্তি নেই কিন্তু স্থায়ির তা আছে তাই ভাবধ্বনি অপেক্ষা রসধ্বনি শ্রেষ্ঠ।

৫। বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর "সাহিত্য দর্পণ" গ্রন্থে, শুধু "রস' কে কাব্যের আত্মাই ঘোষণা করেননি, বস্তু ও অলংকার ধ্বনির কাব্যত্ব অস্বীকার করেছেন। ধ্বনি বলতে তিনি একমাত্র রসধ্বনিকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন, অন্য কোনো ধ্বনিকে নয়।

৬। কোনো কাব্যকে সমগ্রভাবে বিচার না করে যদি খণ্ডভাবে বিচার করা হয় তাহলে তার অংশ বিশেষের মধ্যে বস্তু ধ্বনি কিংবা অলংকার ধ্বনি অনেক সময় অনুভূত হতে পারে কিন্তু অখন্ডভাবে বিচার করলে একটি কাব্যে রসের উদ্রেকই হল আসল কথা। তাই রসধ্বনি প্রধান কাব্যই একমাত্র কাব্য এবং তা শ্রেষ্ঠও বটে। আনন্দবর্ধন রামায়ণ ও মহাভারতের মত মহাকাব্যের সামগ্রিক বিচার করে এগুলির অন্তর্নিহিত রস ধ্বনির দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন।কাব্যের অখন্ডরূপ উপলব্ধি করতে গেলে খন্ডাংশের আলোচনাকে বাদ দিলে চলে না। এই অংশের

আলোচনাতেই বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি ও ভাবধ্বনি গুরুত্ব পায়। সমগ্রের প্রশ্ন যখনই আসে তখনই রসধ্বনির প্রাধান্য। কাব্যের সামগ্রিক বিচারে অন্য ধ্বনিগুলির কোনো পৃথক মূল্য থাকে না, তাই রসধ্বনি শ্রেষ্ঠ।

৩.৫ অনুশীলনী

১।ধ্বনিরাত্ম কাব্যস্য- আলোচনা করো।

২।ধ্বনির শ্রেনিবিভাগ করো।

৩।"রসের ব্যঞ্জনাই বাক্যকে কাব্য করে। *কাব্যের ধ্বনি* হচ্ছে রসের ধ্বনি।" আলোচনা করো।

৪।"রস ধ্বনিই *শ্রেষ্ঠ ধ্বনি।" ব্যাখ্যা করো।*

৩.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। ধ্বন্যালোক- সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত

২। কাব্যলোক- সুধীর কুমার চক্রবর্তী

৩। কাব্য জিজ্ঞাসা- অতুলচন্দ্র গুপ্ত

৪। কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা - অচিন্ত্য বিশ্বাস

৫। ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব - অবন্তীকুমার সান্যাল

একক ৪ - অলংকার ও রীতি

বিন্যাসক্রম

৪.১ অলংকারবাদ

৪.২ রীতিবাদ

৪.৩ অনুশীলনী

৪.৪ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ অলংকারবাদ

ক) "কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ"

কাব্য আলচনায় অলংকারের গুরুত্ব খুব বেশি। এই গুরুতর প্রসঙ্গ বিচার করে একসময় সংস্কৃত কাব্যবিচার শাস্ত্রকে অলংকার শাস্ত্র বলে অভিহিত করা হয়েছিল। ধ্বনি বাদ প্রতিষ্ঠার আগে সংস্কৃত আলংকারিকগণ যে কয়টি বিষয় গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছিলেন 'অলংকার' সেগুলির অন্যতম। অলংকারের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক কি–সেই প্রশ্নের উওর খোঁজার আগে আমাদের জানা দরকার অলংকার কাকে বলে। সাধারণভাবে অলংকার বলতে আমরা 'গহনা' কে বুঝি। এই গহনা দিয়ে মানুষ নিজেকে সজ্জিত করে। সে নিজেকে আংটি, চুড়ি, হার, দুল, মণিবন্ধ ইত্যাদি দিয়ে সাজাতে ভালোবাসে।অলংকার যে কেবল সোনা, রূপা কিংবা হীরে দিয়ে তৈরি হবে, এর কোনো অর্থ নেই। প্রাচীনকালে ফুলকে অলংকার হিসাবে ব্যবহার করার রীতি ছিল। বর্তমানে বিবাহ কিংবা অন্যান্য আনন্দানুষ্ঠানেও ফুলের অলংকার ব্যবহৃত হয়। অলংকার যা দিয়েই নির্মিত হোক না কেন তার উদ্দেশ্য হল মানুষকে সজ্জিত করা।

আমরা আগেই বলেছি যে মানবশরীরের সঙ্গে কাব্য-শরীরের একটা সংগতি আছে। তাই মাঝে-মাঝেই আমরা উভয়ের মধ্যে তুলনার জায়গায় গিয়ে পৌঁছাই। মা যেমন সন্তানকে সাজিয়ে তৃপ্তি পান, কবিও তেমনি অলংকারের মোড়কে কাব্যকে সুন্দর করে তৃপ্ত হতে চান। আসলে মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা এতই তীব্র যে কখনই মানুষ পরিতৃপ্ত। হয় না। মানুষ এক বিশেষ শ্রী ও সৌন্দর্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই সৌন্দর্য কারো ক্ষেত্রে বেশি, আবার কারো ক্ষেত্রে কম। কোনো মানুষই তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যে তৃপ্ত নয়। তাই মানুষ চায় অলংকারের ছোঁয়ায় সৌন্দর্যের মধ্যে Perfection আনতে। নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে মানুষের মনে যে চিরন্তন অভাববোধগুলো আছে, অলংকার সেগুলিকে অনেকাংশে ঢেকে দেয়। রবীন্দ্রনাথ তাই অলংকারকে চরমের প্রতিরূপ' বলেছিলেন। মানুষের মত অবিরও কাজ কাবাজগতে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে পাঠককে আনন্দ দেওয়া; তাই তিনি কাব্য সৃষ্টি করতে গিয়ে অলংকারের ব্যবহার করে থাকেন। মনীষী অতুলচন্দ্র গুপ্তের মতে, "বাক্যের শব্দ আর অর্থকে আটপৌরে না রেখে সাজসজ্জায় সাজিয়ে দিলেই বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে। এই সাজসজ্জার নাম অলংকার। শব্দকে অলংকারে, যেমন অনুপ্রাসে, সাজিয়ে সুন্দর করা যায়, অর্থকে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা নানা অলংকারে চারুত্ব দান করা যায়। কাব্য যে মানুষের উপাদেয়, সে এই অলংকারের জন্য। "কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ।" আসলে মনীষী অতুল গুপ্ত বামনের শেষোক্ত মন্তব্যটিকেই বিস্তৃত আকারে ব্যাখ্যা করেছেন। কাব্যদর্শনে যারা দেহাত্মবাদী ছিলেন তাদের কাছে অলংকারের প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছিল। অলংকার বলতে সংস্কৃত আলংকারিকেরা শব্দ ও অর্থ উভয় অলংকারকেই বুঝিয়েছিলেন। অতুল গুপ্তের মতে অধিকাশে কাব্য পাঠক কাব্যবিচারে দেহাত্মবাদী। তাই তাদের কাব্যের আস্বাদন শব্দ ও অর্থের অলংকারের আস্বাদন ছাড়া অনা। কিছু নয়। এখন প্রশ্ন হল কাব্যের ক্ষেত্রে অলংকারের প্রয়োজন কতখানি। অলংকার ছাড়া। কি সার্থক কাব্য রচিত হওয়া সম্ভব?

খুব সুক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে পৃথিবীতে অলংকারবিহীন কবিতা খুব কম রচিত হয়েছে। তবে এই অলংকারের ব্যবহার সর্বত্র সমান নয়। কোনো কোনো কবির অলংকার ব্যবহারের দিকে ঝোঁক বেশি, আবার কেউ নেহাৎ প্রয়োজন ছাড়া অলংকার ব্যাবহার করেন না। যুগসন্ধির কবি ঈশ্বর গুপ্ত হাজার অলংকার ব্যবহার করে সার্থক কাব্য রচনা করতে অনেক সময় ব্যর্থ হয়েছেন, আবার রবিন্দ্রনাথ অল্প অলংকারে কালজয়ী কাব্য লিখেছেন। অলংকার থাকলেই যে রচনা কাব্য হয় না তার অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। 'সাহিত্যদর্পণ' এর একজন টীকাকার অনুপ্রাস ও রূপক অলংকার সমর্থিত এমন উদাহরণ উপস্থিত করেছেন যাকে কেউ কাব্য বলবে না।

"তরঙ্গনিকরোন্নীততরুণীগণ সংকুলা।

সরিদ বহতি কল্লোলবুহ্যব্যাহততীরভূঃ ।"

কিংবা বাংলা থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক

যখন যাবে জামের বনে জবাগাছের নীচে দিয়ে জয়ের সঙ্গে যেও।

উল্লিখিত উদাহরণটিতে অনুপ্রাসের একটি চমক আছে। তবু পংক্তিটি কাব্য হয়নি। অথচ জয় গোস্বামীর এমন দুটি ছোট কবিতার উল্লেখ করা যায় যেখানে সামান্য অনুপ্রাস ছাড়া কোনো অলংকারই নেই কিন্তু তবুও তা সার্থক কাব্য হয়ে উঠেছে।

(১) ওই মেয়েটির কাছে

সন্ধ্যাতারা আছে (শ্রাবণ)।

(২) তোমার মাথায় পাড়ে সারাদিন কাগে বগে ডিম

রাত্রে বশ হয় দানো, হাতে আনো জাদুর পিদিম। (কবি)

এই দুটি উদাহরণে অনুপ্রাস যেটুকু সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে তাকে ছাপিয়ে উঠেছে কবিতা দুটির অন্তর্নিহিত অর্থ।

খ) "সৌন্দর্যম অলংকার"

বামন তার অলংকার বিষয়ক আলোচনাকে কেবলমাত্র বহিরঙ্গ অলংকার অর্থাৎ শব্দ ও অর্থালংকারের মধ্যে সীমিত রাখেন নি। তিনি অলংকারে বিস্তৃত অর্থ করেছিলেন, যা বোঝা যায় তার অলংকার বিষয়ক আলোচনার দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করলে। “কাব্যম গ্রাহমলংকারাৎ" এই সূত্রটি দেওয়ার পর তিনি পরবর্তী সূত্রে বলেছিলেন, “সৌন্দর্যম অলংকারঃ”। এই সৌন্দর্য বলতে আসলে কি বোঝায় তা জানার প্রয়োজন আছে। বামন তার দ্বিতীয় সুত্রে অলংকার

শব্দের অর্থ করেছেন সৌন্দর্য। আর এই সৌন্দর্যের জন্যই কাব্য পাঠকের কাছে গ্রহণীয় হয়। সৌন্দর্য পাঠকের মনে আনন্দ ও রসের উদ্রেক ঘটায়। "A thing of beauty is joy for ever" কাব্যের জগৎ সৌন্দর্যের জগৎ হলেও দৈনন্দিন কথাবার্তা কিংবা আলাপচারিতার মধ্যে আমরা সৌন্দর্য খুঁজি না। দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যে নিছকই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। অলংকার যেখানে সৌন্দর্য সৃষ্টির সহায়ক হয় সখানেই অলংকার যোজনার সারথকতা। সার্থক কবিদের হাতে অলংকার কখনই কাব্যশরীরের বোঝা হয়ে ওঠে না, তা কাব্যের সৌন্দর্যকে টেনে বার করে আনে। যেখানে অলংকারের জন্য অলংকার ব্যবহৃত হয় সেখানে তা কাব্যসৌন্দর্যের হানি ঘটায়।

অলংকারের সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্পর্কটি পরিস্ফুট হয়েছে আচার্য দণ্ডীর ‘কাব্যাদর্শ’ নামক গ্রন্থে। দণ্ডী বলেছেন, “কাব্যশোভাকরান ধর্ম্মান্ অলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে" অর্থাৎ কাব্যের যে সমস্ত ধর্ম তার শোভা সম্পাদন করে তাই অলংকার। খানিকটা একই সুরে কথা বলেছিলেন আলংকারিক ভামহ। তার মতে, “সুন্দরীর মুখচ্ছবি যত কমনীয় হোক না কেন, ভূষাহীন হলে তা কখনই শোভা পায় না।” ভামহ বলতে চেয়েছেন সুন্দরীর মুখচ্ছবিতে অলংকার যোজিত হলে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। রমনীর ক্ষেত্রে যা সত্য কাব্যের ক্ষেত্রেও সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। কাব্য যত সুন্দরই হোক না কেন, তার সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তোলে অলংকার। তবে এই অলংকারগুলি কেবল শব্দ ও অর্থালংকার নয়, বামন অলংকার বলতে আরও অনেক কিছু বোঝাতে চেয়েছেন। বামন যে কোনো রকম সৌন্দর্যকেই 'অলংকাও’ বলে অভিহিত করেছিলেন। সৌন্দর্য ও অলংকার বামনের কাছে সমার্থক হয়ে উঠেছে। অলংকার যেমন কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি করে

তেমনি রীতি ও গুণগুলিও সৌন্দর্য সৃষ্টির সহায়ক হয়। তাই অলংকার, রীতি, গুণ এসব কিছুকেই বৃহত্তর অর্থে অলংকার বলা যেতে পারে। বামন কাব্য প্রসঙ্গে অলংকারের গুরুত্ব

আলোচনা করতে গিয়ে তাকে যে বৃহত্তর অর্থে গ্রহণ করেছিলেন সেটি না বুঝলে বামন সম্পর্কে ভুল ধারণা থেকে যাবে।

৪.২ রীতিবাদ

ক)" রীতিরাত্মা কাব্যস্য"

'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম' ও 'কাব্যম গ্রাহ্যমলংকারাৎ" মত দুটি বিরুদ্ধবাদী মনীষীদের দ্বারা বিপর্যস্ত হয়েছিল। তখন অলংকারবাদকে একটু শুধরে নিয়ে আর একদল আলংকারিক রীতিবাদের জন্ম দেন। রীতিবাদীদের মতে কাব্যের আত্মা অলংকার নয়, কাব্যের আত্মা হল রীতি। অলংকার ও রীতির মধ্যবর্তী পর্যায়ে সংস্কৃত আলংকারিকেরা আর

একটি বিষয় নিয়ে। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র বিষয়টি "গুণনামে পরিচিত। আচার্য ভর "ত, ভামহ, দণ্ডী, এরা প্রত্যেকেই গুণ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। গুণ সম্পর্কে অতিরিক্ত আলোচনাই সংস্কৃতে রীতিবাদের জন্ম দিয়েছিল। গুণ সম্পর্কে ভাবনার ফলশ্রুতিতে রীতিবাদ। প্রতিষ্ঠার সম্মান আলংকারিক বামনেরই প্রাপ্য। বামন কাব্যাত্মার সন্ধান করতে গিয়ে ক্রমশই অগ্রসর হয়েছেন। প্রথমে কাব্যের গ্রাহ্যতার প্রসঙ্গে অলংকারের কথা বলে তিনি অলংকার বলতে সৌন্দর্যকে বোঝান। আবার এই সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি প্রচলিত অলংকার, গুণ, রীতি এসব কিছুকেই ঠাঁই দিয়েছিলেন। তবে রীতির সঙ্গে সৌন্দর্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও প্রচলিত অলংকারগুলির সঙ্গে রীতির কোনো সম্পর্ক নেই। অলংকারবাদের বিরোধিতা করেই রীতিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

রীতিবাদীদের মতে অলংকৃত বাক্য মাত্রই যে কাব্য নয়, আর নিরলংকার বাক্যও যে কাব্য হতে পারে, তার কারণ কাব্যের আত্মা হল রীতি— "রীতিরাত্মা কাব্যস্য" এই রীতি আসলে পদ রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি, নির্দোষ অবয়ব সংস্থান। অনেকে মনে করেন সংস্কৃত রীতির সঙ্গে ইংরেজি স্টাইলের একটি নিকট সম্বন্ধ আছে। 'অলংকার হচ্ছে এই স্টাইল বা রীতির আনুষঙ্গিক বস্তু। অঙ্গে অলংকার পরলেই মানুষকে সুন্দর দেখায় না, যদি না তার অবয়ব সংস্থান নির্দোষ হয়। স্টাইল হচ্ছে কাব্যের সেই অবয়ব সংস্থান।' এখন জানা দরকার অবয়ব সংস্থান বলতে আমরা কি বুঝি। ধরা যাক একজন মৃৎশিল্পী প্রতিমা গড়ছেন। তার কাছে উপকরণ হিসাবে আছে, কাদা বা মাটি।

এই উপকরণটিকে তিনি মূর্তি রচনার কাজে লাগাবেন। উপকরণটি মূর্তি রচনার কাজে লাগালেও যথেচ্ছ উপকরণ ব্যবহার কখনই শিল্পীর লক্ষ্য হবে না। কারণ তিনি জানেন যে কোথায় কতটুকু মাটি দিলে মুর্তির সৌন্দর্য খুলবে। দর্শকের কাছে মূর্তিটি যাতে দৃষ্টিনন্দন হয়, তার জন্যে শিল্পীর আয়াোজনের ত্রুটি থাকে না। তাই যিনি প্রথম শ্রেণীর মৃৎশিল্পী তিনি কখনই একটা হাত সরু, একটা হাত মোটা, কিংবা একটা চোখ বড় ও একটা চোখ ছোট—এমন মূর্তি গড়েন না।প্রকৃত শিল্পীর হাতে মূর্তির অবয়ব নিখুঁত হয়ে ওঠে। এই নিখুঁত অবয়বে উপযুক্ত স্থানে অলংকার যোজনা করলে মূর্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যে মূর্তির একটা হাত সরু এবং অপর হাত মোটা কিংবা একটি কান লম্বা এবং অপর কান বেটে সেই মূর্তিকে চুড়ি কিংবা দুল পরালে তার সৌন্দর্য তো খুলবেই না বরং বীভৎসতা বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে মূর্তির অয়ব সংস্থানই হল মুখ্য, আর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া অলংকারগুলি হল গৌণ।

মাটির মূর্তিটির ক্ষেত্রে অলংকারগুলি নির্দোষ অবয়বের আনুষাঙ্গিক বস্তু হয়ে দেখা দিতে পারে, কিন্তু তা কখনই অবয়বকে ছাপিয়ে উঠবে না। তাই মনীষী অতুল গুপ্ত বলেছেন যে অঙ্গে অলংকার পরলেই মানুষকে সুন্দর দেখাবে না যদি তার অবয়ন সংস্থানের মধ্যে দোষ থেকে যায়। কাব্যের ক্ষেত্রে এই অবয়ব-সংস্থান, যা স্টাইল বা রীতি নামে পরিচিত, বিশিষ্ট পদরচনার ওপরেই তার সার্থকতা নির্ভরশীল। পদ বিশিষ্ট হয়ে ওঠে

শব্দ ও অর্থের নিপুণ সংযোজন ও বিন্যাস চাতুর্যে। এর মধ্যে দিয়ে কবির অন্তরের স্বভাব ধরা দেয়।

রীতিরাত্মা কাব্যস্য সুত্রের প্রবক্তা আচার্য বামনও রীতি বলতে পদ রচনার বিশিষ্টতাকে বুঝেছিলেন। তার মতে পদ বিশিষ্টতা লাভ করে গুণযুক্ত হলে। অর্থাৎ বিশিষ্টতা হল গুণময়তা। ওজঃ, প্রসাদ, মাধুর্য প্রভৃতিগুণের সহযোগে পদ বিশিষ্ট হয়ে ওঠে এবং সেই গুণগুলি কাব্য সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। তাই রীতি বলতে আমরা বুঝি গুণময় পদ রচনাকে। মনে রাখা দরকার যে কাব্যদেহের অন্তর্গত পদগুলি যুক্ত হলে এবং তা রচিত হলে তখনই তাকে আমরা রীতি বলতে পারবো। আমরা বামন কথিত যে গুণগুলির কথা বললাম তার সঙ্গে পদ কিংবা রচনার কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ রীতির তা আছে বলেই রীতির স্থান গুণের উর্ধের্ব। বিশ্বের অনেক লেখকই রীতি বা স্টাইলের গুণে বিখ্যাত হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তার স্টাইলের জন্যে বিখ্যাত। কোন কোনো সংস্কৃত আলংকারিক দেশভেদে রীতির বৈচিত্রের কথা বলেছেন। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যে ব্যক্তির সঙ্গে স্টাইল বা রীতির সম্পর্কটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে— 'style is the man' তবে রীতিবাদে এসেই সংস্কৃত আলংকারিকেরা থেমে যাননি, কাব্যাত্মার সন্ধানে তারা আরও বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন।

খ) সংস্কৃত রীতিবাদ ও পাশ্চাত্য স্টাইলঃ তুলনামূলক বিচার

আচার্য বামনের রীতি বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে যে কথাটি অনিবার্য ভাবে মনে আসে, তা হল সংস্কৃত রীতি ও পাশ্চাত্য স্টাইল বিষয় হিসাবে এক কিনা। খুব হাল্কাভাবে দুটি শব্দকে গ্রহণ করলে উভয়ের মধ্যে একটি আপাত সংগতি আবিস্কৃত হতে পারে, কিন্তু যদি স্টাইলের প্রকৃত অর্থ অন্বেষণ করা যায়তাহলে রীতির সঙ্গে তার সাদৃশ্য , অপেক্ষা পার্থক্যটিই প্রতীয়মান হয়। আর তাই মনীষী অতুলচন্দ্র গুপ্ত যতই বলুন না কেন, 'রীতি হল পদরচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি। ...অর্থাৎ কাব্যের আত্মা হল স্টাইল।' তখন সেই সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নিতে পারি। অতুলচন্দ্র গুপ্ত বারবার তার "কাব্যজিজ্ঞাসা" গ্রন্থে স্টাইল ও রীতি শব্দ দুটিকে সমার্থ বোধক করে তুলেছেন। যেমন পূর্বের উদ্ধৃতির মতই তিনি অন্যত্র আবার বলেছেন, 'অলংকার হলেছ এই সটাইল বা রীতির

আনুষঙ্গিক বস্তু। -স্টাইল হচ্ছে কাব্যের সেই অবয়ব সংস্থান। সটাইল ও রীতিকে কখনই স্টাইল বা রীতি বলা যায় না। সামান্য একটি অব্যয়ের ব্যবহারভেদে স্টাইল ও রীতির পার্থক্যটিই মুছে যায়। বা অব্যয়ের প্রয়োগে মনীষী সমালোচক সংস্কৃত রীতি ও পাশ্চাত্য স্টাইলের এর পার্থক্য যতই মুছে দিতে চান না কেন, সেই পার্থক্য যে মোছা যায় না, তা স্টাইল কাকে বলে সেই আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে।

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। তিনি বলেছিলেন, "(Style) invented by the poet himself " বুঁফো সেই একই কথার প্রতিধ্বনি করেছিলেন, 'Style is the man' জার্মান দার্শনিক গ্যেটে 'একারম্যান' এর সঙ্গে সংলাপসূত্রে বলেছিলেন, লেখকের স্টাইল হল তার আপন মনের বিশ্ব প্রতিনিধি ;অতএব স্বচ্ছ রীতি লেখা যদি কেউ লিখতে চান, তাহলে আগে তিনি হোন স্পষ্ট ভাবনায় ভাবুক। Wordsworth এর ভাষায় স্টাইল হল,

" that element of literary composition in which ..... the writer unconciously expresses his own temperament or circumstances." বেন জন্স ভালো লেখার অন্যতম শর্ত হিসাবে লেখকের নিজস্ব স্টাইলের বিশেষ অনুশীলনের কথা বলেছিলেন। স্টাইল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সর্বপ্রথম বিষয়বস্তুর ভাবনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারণ কোন কথা কিভাবে লেখা উচিত তা বিষয়বস্তুর ভাবনা থেকেই। লেখকের মনে জন্ম নেয়। তারপর আছে শব্দ নির্বাচন, রচনা-সৌষ্ঠবের দিকে নজর রেখে বস্তু, বাক্য ও শব্দের যথোচিত বিন্যাস। জনসনের মতে আত্তরিক পরিশ্রমের সঙ্গে ঘনঘন অভ্যাস ও অনুশীলন ছাড়া স্টাইল আয়ত্ত করা যায় না। _ উনিশ শতকের লেখক ওয়াল্টার পেটার স্টাইল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, জ্ঞানে হোক,অজ্ঞানে হোক, লেখকের লক্ষ্য যে পরিমাণে জগতের বসত্যের চেয়ে বস্তুর বোধসত্যের প্রকাশে ব্রতী হয়, লেখক সেই পরিমাণেই যথার্থ শিল্পীর মর্যাদা লাভ করেন। বোধসত্যের কথা বলতে গিয়ে পেটার নিশ্চিতভাবে ব্যক্তি-লেখক, তার ভাবনা ও রচনাশৈলীকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ইংরেজিতে অনেক সময়েই স্টাইল কথাটির দ্বারা Composition বা শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ ইত্যাদি বিন্যাসের

কায়দা বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু সেই কায়দা আসলে লেখকেরই মনোভঙ্গি। যান্ত্রিকভাবে কতকগুলি বিধিনাত্র অনুসরণ করে যে লেখক তার শব্দ-বাক্য-অনুচ্ছেদ সাজিয়ে সন্তুষ্ট হন, তিনি নিছক স্টাইলহীন Composition এর গণ্ডীতেই বন্দী থাকেন, কিন্তু যে মুহূর্তে সেখানে তার স্বাধীন মনোভঙ্গির ছোঁয়া লাগে, সেই মুহূর্তেই লেখা স্টাইলের গুণে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং এ কথা আমরা বলতেই পারি যে, রচনা বিশেষের স্টাইল হল লেখকের বাোধসত্যের রঙ। লেখক যেখানে অনুপস্থিত সেখানে। স্টাইলের কোনো মূল্যই নেই।

স্টাইল শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমালোচক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তার 'কাব্যবিচার' গ্রন্থে লিখেছেন, "ইংরেজিতে Style বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক চিন্তাশীল লেখকের চিন্তার এক একটি স্বতন্ত্র ধারা আছে। লেখকের যে বক্তব্য বিষয় তাহা। তাহার অন্তর হইতে একটি বিশিষ্ট ক্রমে সজ্জিত হয় এবং সেই ক্রমের অনুকুলতায় তিনি শব্দ সঞ্চয় ও শব্দ ব্যবহার করেন। তাহার সেই চিন্তাধারা তাহার সমগ্ন পুরুষীয় স্বভাবের। একটি ছাপ লইয়া আসে। তিনি যেভাবে উপমা আহরণ করেন, যেভাবে একটি শব্দের পর আর একটি শব্দ বসান, তাঁহার চিন্তার বিভিন্ন অংশগুলি যেভাবে সাজান, বক্তব্য অর্থকে যেভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন, সেই সমস্তগুলি তাহার স্বস্থলবাহি চিন্তাধারার অঙ্গীত। চিন্তাধারার পার্থক্যই স্টাইলের পার্থক্য। ...ইংরেজিতে style একটি অন্তর্বাপার, বহিরঙ্গ শব্দ। বা বাক্যবিন্যাস সেই অন্তর্ধারার সূচক মাত্র।"

সংস্কৃত আলংকারিক বামন রীতির আলোচনা করতে গিয়ে সেটিকে কখনই লেখকের অন্তর্দেশের ব্যাপার বলে স্বীকার করেন নি। আমন ও বামন পাছী রীতিবাদীরা বিশ্বাস করতেন যে শব্দার্থময় সাহিত্যের সন্ধা ও অর্থের বিশেষ কতকগুলি গুণের জন্যই বাক্য বা বাক্যময়। রচনা কাব্য হয়ে ওঠে। এই গুণগুলির অভাব ঘটলে কাব্যত্বের

হানি ঘটে। পাশ্চাত্য স্টাইলের সঙ্গে যেমন লেখকের ব্যক্তিগত মনোভঙ্গির প্রসঙ্গটি খুব সুস্পষ্ট রূপে ঘোষিত হয়েছে বামন কিন্তু কাব্যে গুণযুক্ত পদবিন্যাসের সঙ্গে কবিস্বভাবের সম্পর্কটিকে মোটেই ততটা সুস্পষ্ট করতে পারে নি, বরং তার আলোচনা

থেকে এটাই মনে হয় রীতির সঙ্গে লেখকের মনের যেন কোন যোগই নেই। যদি আগে থেকেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় এই এই গুণ থাকলে কাব্য হবে, আর এর অভাব ঘটলে কাব্য হবে না, তবে কাব্যবিচার নিত্যন্ত বহিরঙ্গের বিচার হয়ে দাড়ায়। লেখকের বোধসত্য ও মনোভঙ্গির প্রসঙ্গটি সেখানে ব্রাত্য হয়ে যায়। বোধ করি এই জন্যই ভামহ বামনের সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। ভামহ কাব্যবিচার করতে গিয়ে। দোষ, গুণ, রীতি—এগুলিকে তেমন গ্রাহ্য করেননি। তার মতে একটি নির্দিষ্ট রীতিতে লিখলে কাব্য হয়, অথচ অন্য রীতিতে লিখলে কাব্য হয় না, এটা কোনো কাজের কথা নয়। বামনের প্রতিপক্ষরা দোষ ও শুণের কাব্যের মধ্যে স্থান নেই, এমন কথা যদি বলেন নি, কিন্তু দোষ শুণের ওপর নির্ভর করে যে কাব্য বিচার চলে না তা স্বীকার করেছেন। বামন শোভা ও সৌন্দর্যকে কাব্যের প্রাণ বলে স্বীকার করলেও, এই শোভা-সৌন্দর্যকে একান্তভাবেই শব্দ ও অর্থগত মনে করেছিলেন। এই জন্য তার কাব্যবিচার হয়ে উঠেছে একান্তভাবে objective বা বহিরঙ্গ বিচার। কিন্তু স্টাইলের আলোচনা যেহেতু লেখক ও তার মনোভঙ্গিকে গুরুত্ব দিয়েছে তাই কাব্য বিচারও সেখানে Subjective বা অন্তরঙ্গ ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

বামন রীতি ও সৌন্দর্য সম্পর্কে অতি মূল্যবান কিছু কথা বললেও তিনি রীতিগুলিকে ভৌগোলিক গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ রেখেছেন এবং তদনুযায়ী নামকরণও করেছেন, যেমন বৈদভী, গৌড়ীয়া, পাঞ্চালী। ইংরেজি স্টাইলের আলোচনায় কিন্তু ভূগোল গুরুত্ব পায়নি, গুরুত্ব পেয়েছে লেখক বা লেখকের মন। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে রীতিগুলিকে সীমাবদ্ধ রাখায় বামনের রীতিবাদ সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

রীতিবাদ বর্তমানে একটি static conception কিন্তু স্টাইল হল Dynamic conception বহুকাল পূর্বে সংস্কৃত আলংকারিকগণ রীতিবাদের আলোচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সেই আলোচনায় আর কোনো বিবর্তন চোখে পড়ে না। আজ সংস্কৃত মৃতভাষা বলে রীতির চর্চাও থেমে গেছে। কিন্তু পাশ্চাত্যে স্টাইল নিয়ে আজও ভাবনার শেষ নেই। পাশ্চাত্যে সাহিত্যের যত অগ্রগতি হচ্ছে সেই অনুযায়ী স্টাইলেরও আলোচনা হচ্ছে। স্টাইল যে ব্যক্তির প্রকাশ, সেই লেখক যে কালের, যে সমাজের, যে

জাতির সেই সবের সঙ্গে যুক্ত করেই স্টাইলের বিচার চলেছে। কিন্তু আমাদের দেশে সংস্কৃত আলংকারিকদের চিত্তাভাবনা বহু শতাব্দী পূর্বে শেষ হয়ে গেছে।

আলংকারিকদের ভাবনা শেষ হয়ে যেতে পারে, সংস্কৃত ভাষা মৃতভাষা হতে পারে, তবু ভারতবর্ষে একাধিক ভাষায় আজও নতুন নতুন সাহিত্য রচিত হয়ে চলেছে। এই সাহিত্যের সমাজ পটভূমি, চিন্তাভাবনা, রচনাশৈলী সবই সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আলাদা। তাই সংস্কৃত রীতিবাদের আদলে এগুলির বিচারও ঠিক নয়। আজ আমাদের কাছে সংস্কৃত রীতিবাদ নয়, অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক পাশ্চাত্য স্টাইল। কারণ স্টাইল লেখককে গুরুত্ব দেয়, যুগে যুগে কালে কালে সে লেখক যেমনই হোন না কেন।

৪.৩ অনুশীলনী

১।"কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ" ব্যাখ্যা করো।

২।অলংকারবাদ সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩।রীতিবাদ কাকে বলে?

৪।রীতিরাত্মা কাব্যস্য-ব্যাখ্যা করো।

৪.৪ গ্রন্থপঞ্জী

১। ধ্বন্যালোক- সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত

২। কাব্যলোক- সুধীর কুমার চক্রবর্তী

৩। কাব্য জিজ্ঞাসা- অতুলচন্দ্র গুপ্ত

৪। কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা - অচিন্ত্য বিশ্বাস

৫। ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব - অবন্তীকুমার সান্যাল

একক ৫ - বক্রোক্তিবাদ ও ঔচিত্ত্যবাদ

বিন্যাসক্রম

৫.১ বক্রোক্তিবাদ

৫.২ ঔচিত্যবাদ

৫.৩ অনুশীলনী

৫.৪ গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ বক্রোক্তিবাদ

সাধারণ অর্থে বক্রোক্তি বলতে বাঁকা কথাকে বোঝানো হয়ে থাকে। সংস্কৃত ও বাংলা অলংকার গ্রন্থে বক্রোক্তিকে শব্দালংকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই অলংকারটি আবার দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত, কাকু ও শ্লেষ। উচ্চারণ বা কণ্ঠ স্বরের ভঙ্গির ওপর নির্ভর করে কাকুবক্রোক্তি অলংকার হয় এবং শ্লেষ বক্রোক্তিতে বাহ্য অর্থ ছাড়াও অন্য একটি অর্থ থাকে। সংস্কৃত আলংঙ্কারিক মম্মট ও রুদ্রট বিক্রোক্তিকে শব্দালংকার হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভামহ, দণ্ডী ও বামন শব্দালংকার থেকে বক্রোক্তিকে পৃথক করে নিয়েছিলেন। বক্রোক্তিবাদের সর্বময় প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল কুন্তকের হাতে; কিন্তু তার আলোচনা পূর্বসূরীদের আলোচনার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে।

দণ্ডী ‘বক্রোক্তি’ কথাটির দ্বারা ‘স্বভাবোক্তি’ থেকে যাবতীয় অলংকারের পার্থক্য নির্ণয় করেছিলেন। তিনি সব অলংকারকেই বক্রোক্তি বলতে চেয়েছেন। দণ্ডী ‘স্বভাবোক্তি’ কে প্রথম কাব্যালঙ্কার বা “আদ্যা অলংকৃতিঃ” বলে চিহ্নিত করেন। তিনি পৃথক পৃথকভাবে একাধিক অলংকারের আলোচনা করলেও উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অবয়ব, অনন্বয়, সন্ধেয়কে পৃথক অলংকারের মর্যাদা দিতে রাজি ছিলেন না। তার কাছে ‘শ্লেষ” হল

সমস্ত অলংকারের চমকারিত্ব বিধায়ক। দণ্ডী বাঙময় কাব্যকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন—স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি। তিনি মনে করতেন বক্রোক্তির সৌন্দর্য নির্ভর করে শ্লেষের ওপর।

আচার্য ভামহও প্রচলিত অর্থে 'বক্রোক্তি' কথাটিকে গ্রহণ করেননি। তিনি শব্দার্থের মিলনকে সাহিত্য বললেও সেই মিলনের বক্রতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অথাৎ শব্দার্থময় সাহিত্যে শব্দ ও অর্থের যে মিলন ঘটে তা হয় বক্র। তিনি বক্র বলতে আরও কিছুকে বুঝেছিলেন। সাধারণভাবে শব্দার্থ থেকে যা বাোঝা যায় বক্রমিলনে তার থেকে আর একটি বেশি বাোঝানাোই কবিদের উদ্দেশ্য থাকে। একমাত্র বক্রোক্তিই পারে সেই আরও কিছুর ইঙ্গিত দিতে। ভামহ, মনে করতেন, অলঙ্কার মাত্রই বক্রোক্তি! নাটক, মহাকাব্য, কথা, অখ্যায়িকা সর্বত্রই বক্রোক্তি থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি বক্রোক্তিকে 'লোকাতিক্রান্ত গোচরং বচঃ' বলেছিলেন। 'লোকাতিক্রান্ত' বলতে তিনি

দৈনন্দিন ভাষা

থেকে পৃথক অন্যজাতের ভাষাকে বুঝিয়েছিলেন। তিনি সব অলংকারের মধ্যেই একটি অতিশয়োক্তির ভাব লক্ষ্য করে বক্রোক্তিকে অতিশয়োক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন—"সৈযা সর্বৈব বক্রোক্তি।" আর 'সৈযা' বলতে অতিশয়োক্তিকে বুঝিয়েছিলেন। অর্থাৎ ভামহের মতে সব অলংকারই এক হিসাবে অতিশয়োক্তি ও বক্রোক্তি। সুতরাং ভামহের বক্রোক্তি বিষয়ক আলোচনায় দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রথমতঃ তিনি

বক্রোক্তিকে মম্মট বা রূদ্রটের মত নিছক শব্দালংকার হিসাবে মেনে নেননি এবং দ্বিতীয়তঃ বক্রোক্তির মধ্যে তিনি লোকোত্তর বিষয়ের ইঙ্গিত করেছিলেন।

আচার্য বামনও বক্রোক্তিকে-শব্দালংকার বলতে চাননি। তিনি বক্রোক্তিকে লক্ষণার দ্বারা রচিত ভিত্তি অলঙ্কার বলে চিহ্নিত তুলেছিলেন এবং এই অর্থালঙ্কারে সাদৃশ্যের সাহায্যে লক্ষচনার ভিত্তি রচিত হয় বলে মনে করেছিলেন।

কুন্তক তার 'বক্রোক্তিজীবিতম' গ্রন্থে যে বক্রোক্তি তত্ত্ব আলোচনা করেছেন তার অনেকটাই ভামহের তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। কুন্তক শব্দ ও অর্থের

মিলিত রূপকে সাহিত্য বলে গণ্য করলেও নিছক শব্দার্থের মিলনকে সাহিত্য বলেন নি। শব্দ ও অর্থের মিলন যখন আহ্লাদজনক হয়ে ওঠে তখনই তা সাহিত্য পদবাচ্য হয়। কাব্য ও সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কুন্তক বলেছিলেন।

শব্দার্থৌ সহিত বক্রকবিব্যাপারশালিনি

বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্য তদ্বিদাহ্লাদকারিণি।।

অর্থাৎ মিলিত শব্দার্থ কাব্যরসিকদের আহ্লাদজনক বক্তৃতাময় কবি ব্যাপারপূর্ণ রচনাবঙ্গে বিন্যস্ত হলেই কাব্য হয়ে থাকে। তিনি অন্যত্র বলেছেন, এই কাব্য রসিকজনের "অদ্ভুতামোদ চমৎকার" বিধান করে। শব্দ হল বাচক এবং অর্থ তার বাচ্য। এদের মিলিত সত্ত্বাকে কাব্য বলে। কেবল শব্দও কাব্য নয়, আবার কেরল অর্থও কাব্য নয়। উভয়ের যুগপৎ মিলনে কাব্য হয়। কুন্তক বলেছিলেন যে, প্রতিভার দারিদ্র্যের জন্য যারা কেবলমাত্র শব্দমাধুর্য সৃষ্টি করতে চান তারা কাব্যের যথার্থ সম্পদ প্রকাশ করতে পারেন না। আবার কেবলমাত্র অর্থ চাতুরে দ্বারা শুরু তর্কের গাথুনি গাঁথলেও কাব্য হয় না। প্রতিভার দ্বারা প্রথমে বর্ণনীয় বস্তু কবিচিত্তে মণিখণ্ডের মত প্রতিভাত হয়। অস্ফুট ভাবে যা মনের মধ্যে প্রতিভাত হই তা যদি বক্রবাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় তা উজ্জ্বল হীরের মালার ন্যায় শোভা

পায় ও অভিব্যক্তির আনন্দ উৎপাদন করে এবং তখনই তা কাব্যত্ব লাভ করে। কুন্তক বলেছিলেন যে একই কথা ভঙ্গিগত বিভিন্নতার কারণে- অর্থাৎ বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হওয়ার জন্য কাব্যসম্পদের পার্থক্য রচনা করে।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, কুন্তক শব্দ ও অর্থের মিলিত সত্ত্বার চমৎকারিত্বের মধ্যে কাব্যত্ব অন্বেষণ করেছেন তার প্রকৃত অর্থ কি ? শব্দ ও অর্থ তো সর্বদা মিলিতই থাকে। বাচ্য ও বাচক, অর্থ ও শব্দের কোনোখানেই তো মিলিত সত্ত্বার অভাব নাই। তবে এদের মিলনে কাব্য হয় একথা বলার অর্থ কি? এর উত্তরে কুন্তক বলেছেন যে কাব্য হতে গেলে শব্দার্থের মিলিত সত্ত্বার একটি বিশিষ্টতা আবশ্যক। যাকে শব্দার্থের 'সাম্য অবস্থান' বলা চলে।

এই মিলন হবে ন্যুনতা এবং বাহুল্যবর্জিত মনোহারী মিলন। অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ কেউ কারও চেয়ে ছোট বা নিকৃষ্ট হবে না,আবার বড় বা উৎকৃষ্টও হবে না। তারা হবে পরস্পর স্পর্কিত রমণীয়-পরম্পরকে স্পর্ধা করে সমানভাবে

বড় হয়ে উঠে পরস্পরের সংযোগে তারা রমনীর হয়ে উঠবে। এই পরস্পর স্পর্ধা প্রতিযোগিতামূলক হলেও শত্রুভাবাপন্ন নয়, মিত্রভাবাপন্ন। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে থাকবে একটা সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন। একে অনেকটা তুলনা

করা যেতে পারে মাঠের দুটি বড় তালগাছের সঙ্গে। উদ্ভিদবিদরা বলেন যে মানুষের মত গাছের মধ্যেও বড় হওয়ার প্রতিযোগিতা চলে। এর ফলে পাশাপাশি অবস্থিত দুটো বড় গাছ উভয়ে উভয়কে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতার নামে, কিন্তু সেই প্রতিযোগিতার মধ্যে কোনো অসুস্থতা থাকে একটা গাছ আর একটা গাছকে ঠেলে ফেলে দিয়ে কখনই বড় হয় না। অনুরূপভাবে শব্দ ও অর্থও পরস্পরকে স্পর্ধা করে বড় হয়ে উঠলেও তাদের মধ্যে থাকে সৌভ্রাতৃত্ব। এই সৌভ্রাতৃত্বের ফলেই কাব্য রমণীয় হয়ে ওঠে। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধের বিশিষ্টতা অর্থাৎ সৌকুমার্য ও সূক্ষ্মতা না থাকলে কাব্য হয় না। কাব্যশিল্পের না চাই একদিকে পরম্পন্ন অর্থের সামঞ্জস্যের ক্রমবিকাশ ও অন্য দিকে সেই অর্থের সমঞ্জস্যে শব্দের মিলন। অর্থাৎ কাব্য রচনার সময় দেখা দরকার শব্দগুলি অর্থের আনুকুল্য করেছে কিনা বা সেগুলির বিন্যাসে অর্থ কলুষিত হয়েছে কিনা। পরস্পর প্রতিস্পর্ধীভাব কিভাবে একটি অখণ্ড অর্থসম্পদ ফুটিয়ে তুলে যথার্থ কাব্য হয়ে ওঠে তার প্রমাণ দিয়েছেন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ‘মালতিমাধব’ এর একটি শ্লোক উদ্ধার করে। কোনো কাপালিক কোনও সুন্দরী নায়িকাকে বধ করতে উদ্যত হলে কোন ব্যক্তি নায়িকার অসাধারণ লাবন্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন -

অসারং সংসারং পরিমুষিতরত্ন ত্রিভুবনং

নিরালোকং লোকং মরণশরণং বান্ধবজনং।

অদর্প কন্দর্প জননয়ননির্মাণমফলং।

জগজ্জীর্নারণ্যং কথমসি বিধাতুং ব্যবসিতঃ ।।

এই শ্লোকে নায়িকা নিহত হলে সংসারের কি ক্ষতি হবে তা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি চিত্রে এক একটি কথা মনে হয়েছে এবং পরক্ষণেই মনে হয়েছে ঐটুকুই যেন যথেষ্ট নয়। এই অভাববোধ থেকে তার মনের মধ্যে আবার নতুন ভাবের উদয় হয়েছে এবং পরস্পর স্পর্ধিত ভাবগুলি কাব্যের অখণ্ড অর্থসম্পদ গড়ে তুলেছে। প্রথমে কবির মনে হয়েছে, নায়িকা নিহত হলে সংসার অসার হবে, কিন্তু এতে কবির মনোবেদনা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি জেনেই তিনি আর বলছেন, সমস্ত ত্রিভূবনের একমাত্র রত্ন অপহৃত হবে পৃথিবীর আলো নিভে যাবে, মানুষের চক্ষুনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দূর হবে, জগৎ শুষ্ক অরণ্য হবে। এমনি করে এক একটি ভাবের পাপড়ি পরস্পর প্রতিযোগিতায় যুটে উঠে একটি সমগ্র-ভাবমল ফুটিয়ে তুলেছে। কিন্তু যদি কবি এখানে একটি ভাবের দ্বারা চমৎকারিত্ব ফোটাতে চাইতেন তবে তা এতো সুন্দর হত না। এখনে অনেকগুলি পরস্পর প্রতিস্পর্ধী ভাব বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে বড় হয়ে উঠেছে বলেই কাব্যটি রমণীত হয়েছে।

কুন্তক বক্রোক্তি বিষয়ে যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন সেখানে বাইরের জগৎ বা বস্তু জগৎ উপেক্ষিত হয়নি। কাব্য রচনার সময় এই জগৎ কবিচিত্তে ঠাই পায় এবং তার অন্তরে গভীর আলোড়ন জাগায়। এই আলোড়নের ফলে

বাহ্যজগৎটি কবির মনে আর পূর্বাবস্থায় থাকে না। তা তার অন্তরলোকে ভাবময় অলৌকিক রূপ পরিগ্রহ করবে। এমতাবস্থায় অলরের। পত্রিমনে বা আলোড়নে কবি এমন সমস্ত শব্দ নির্বাচন করেন যা ভাবনায় কাজটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অর্থাৎ কবির মনের মধ্যে বাইরে বিষয়বস্তুজাত যে নবীন ভাবময় দেহখানি ফুটে ওঠে তাই যেন স্বমহিমায় শব্দরূপে অবর্তীণ হয়। অলৌকিক ব্যাপার-মাহাত্ম জাগতিক বস্তু যেমন কবিচিত্তে ভাবময় হয় তেমনি যথোপযুক্ত শব্দ নির্বাচন, সঞ্চয়ন ও বিন্যাস সেই অলৌকিক ব্যাপারেই ফল। কাব্য সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি হল প্রথমতঃ বাহ্য জগতের ভাবরূপ পরিগ্রহ এবং দ্বিতীয়ত পরিগৃহীত ভাবরূপটিকে যথাযথ শব্দ জাগে পরিবর্তন। যে কোনো সার্থক সাহিত্যই এই ভাবরূপ ও শব্দরূপের যথাযথ মিলন।

একটু সহজ ভাবে কুন্তকের বক্তব্যকে বোঝা যেতে পারে। আমরা দেখেছি, বস্তু জগতের সঙ্গে ভাব জগতের ভাবময় হাতের একটা পার্থক্য আছে। তেমনি লোকমুখে ব্যবহৃত সাধারণ লৌকিক জগৎ অর্থাৎ কাব্য বা সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দের পার্থক্য আছে।ভাব যে রূপে যেভাবে কবির মনের মধ্যে ফুটে ওঠে ঠিক তার উপযোগী শব্দ ও তার মনে জন্ম নেয়। ভাব উপযোগী শব্দ যদি স্বমহিমায় প্রকাশিত না হতো তবে সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা অনেকাংশে ব্যাহত হতো। শব্দ ভাবের পরিপোষকতা না করলে সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। যথার্থ ভাবরূপের সঙ্গে যথার্থ শব্দের মিলনে সাহিত্য গড়ে ওঠে । সার্থক কবির কাছে দুটি একই প্রযত্নে জন্ম নেয়। এদের জন্য আলাদা আলাদাভাবে পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়।

অর্থ প্রসঙ্গে কুন্তক বলেছেন যে, বাইরের জগত নানারকম ভাব ধর্মের দ্বারা আমাদের মনের মধ্যে রচিত হতে পারে। কিন্তু সে ভাবধর্মের দ্বারা রচিত হলে অর্থাৎ যে বিশেষ ভাবরূপ পরিগ্রহ করলে তা সহৃদয়গণের আহ্লাদের কারন হয় তাই কাব্যাকারে পরিণতি লাভ করে। অন্তরের আলোড়নজাত যে সমস্ত শব্দ কবি নির্বাচন করেন সেই অর্থ কবির অভিপ্রেত। এই জাতীয় শব্দ ও অর্থের মিলনে যে ভাব ধরা দেয় তা অলৌকিক। শব্দ এ অর্থের এই ধরনের মিলন, যা অন্যভাবে কাব্যের শৈল্পিক ধর্ম (Aesthetic quality) রূপে ব্যাখ্যাত হতে পারে তাকেই কুন্তক ‘বক্রতা’ নামে অভিহিত করেছেন।

কুন্তক কোনো বস্তুর স্বভাবমাত্র বর্ননাকে অলংঙ্কার বলতে চাননি। কেননা তিনি মনে করতেন, যাই বর্ননা করা হোক না কেন তার স্বভাবটা সেখানে থাকবেই। সেই স্বভাবের অতিরিক্ত কোনো ভাব ধর্ম যুক্ত না হলে কোনো অলংকার সৃষ্টি হতে পারে না। এইজন্যে কুন্তক দণ্ডীর স্বভাবোক্তি অলংকারকে বর্জন করেন। অভিনবগুপ্ত অলংকার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, যা রসের শোভাবৃদ্ধি না করে তা অলংকারই নয়। তার মতে অলংকার হল রসের ‘শোভা-সম্পাদক ধর্ম।” কুন্তক রসের প্রসঙ্গে না হলেও বক্রতার প্রসঙ্গে অন্বিত করে অলংকারের বিচার

করেছেন। প্রচলিত অলংকারগুলির কোনো মূল্যই থাকে না যদি না সেগুলি বক্রতার সঙ্গে অন্বিত হয়ে কাব্য শোভা বৃদ্ধি করে। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হলেই প্রচলিত

অলংকার গুলি যথার্থ স্থান লাভ করে; তখন তা বক্রোক্তিরই একটা স্তর হয়ে ওঠে। এইভাবে কুন্তক বক্রোক্তির মধ্যে প্রচলিত অলংকারগুলি অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন।

কুন্তক রীতির আলোচনা করতে গিয়ে বামনের তিনটি এবং দণ্ডীর দেওয়া দুটি রীতিকে অস্বীকার করেছেন। তার মতে দেশ বিশেষে কোনো রীতির নামকরণ করা হতে পারে না। রীতির মধ্যে দিয়ে কবির স্বভাবটি যেহেতু ধরা পড়ে তাই তা দেশ-বিশেষের ধর্ম হতে পারে না। তিনি রীতির পরিবর্তে তিনটি "মার্গ" এর কথা বলেছিলেন। এগুলি হল—সুকুমার, বিচিত্র ও মধ্যমমার্গ। এই মার্গগুলির মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ বা কোনটা নিকৃষ্ট এ প্রশ্ন অবান্তর। কবির স্বভাবজনিত কারণে লিখন প্রণালীতেও অসংখ্য পার্থক্য থাকতে পারে। আমাদের দেখা কর্তব্য রচিত কাব্যটি রমণীয় হয়ে উঠেছে কিনা। তিনরীতির যে কোনো একটিতে সাহিত্য রচনা করেই অমর হওয়া সম্ভব।

গুণের আলোচনা করতে গিয়ে কুন্তক গুণকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন—সাধারণ ও অসাধারণ। সৌভাগ্য, ঔচিত্যকে তিনি বলেছেন সাধারণগুণ এবং মাধুর্য,প্রসাদ, লাবণ্য ও আভিজাত্যকে বলেছেন অসাধারণ গুণ। যে কোনো উত্তমকাব্যে সৌভাগ্য ও ঔচিত্যগুণ থেকেই কিন্তু সুকুমার ও বিচিত্র মার্গের কাব্যে থাকে অসাধারণ গুণ। অসাধারণ গুণগুলির স্বভাব মার্গ অনুযায়ী ভিন্ন হয়। গুণের আলোচনা করতে গিয়ে কুন্তক অন্তত তিনটি গুণের কথা বলেছিলেন যা একে বারেই অভিনব । এগুলি হল লাবণ্য, আভিজাত্য ও সৌভাগ্য । কুন্তকের গুণের আলোচনাও তার বক্রোক্তির আলোচনার মতোই ভাস্বর।

কুন্তক বক্রোক্তি আলোচনা অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে করেছিলেন। তিনি তার মধ্যে অলংকার, গুণ, রীতিকেও যুক্ত করে নিয়েছিলেন। আনন্দবর্ধন কবিপ্রতিভার সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন ব্যঞ্জনাময় ধ্বনির মধ্যে, আর কুন্তক পেয়েছিলেন বক্রোক্তির মধ্যে। বক্রোক্তিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে কুন্তক তাঁর ‘বক্রোক্তিজীবিত’ গ্রন্থে ধ্বনির স্বাধীন অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছিলেন—"The Vikroktijibit denies the independent existence of Dhavani...as the soul of the poetry and tries to include it under its all pervading Vakrokti." (History of

Sanskrit Poctics, P.V. Kane). শব্দার্থের যে নিপুণ সূক্ষ্ম আলোচনার মাধ্যমে কাব্য ব্যাপারকে অলৌকিক অভিধায় ভূষিত করেন সেই আলৌচনার গভীরতা রীতিমত বিস্ময়কর। শব্দার্থের আলোচনার পাশাপাশি কুন্তক বাক্যগত, প্রকরণগত, প্রবন্ধগত সাহিত্যের কথাও বলেছিলেন। তিনি বক্রোক্তিকে যে ছয়টি শ্রেণীতে (বর্ণবিন্যাস বক্রতা, পদপূর্বাধ বক্রতা, পদপরাধ বক্রতা, বাক্যবৈচিত্র্য বা বস্তু বক্রতা, প্রকরণবক্রতা ও প্রবন্ধবক্রতা) বিভক্ত করেছিলেন সেগুলির মধ্যেই তার প্রমাণ আছে। এর থেকেই বোঝা যায় কুন্তকের বক্রোক্তির বিষয়ক আলোচনার বৈচিত্র্য ও গভীরতা কতটা ছিল।

৫.২ ঔচিত্যবাদ

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে ঔচত্য সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে এবং কাব্যের জগতে ঔচিত্যের গুরুত্বের বা কতটুকু সেই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের আগে সহজভাবে ঔচিত্য বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরা যাক কোনো ব্যক্তি একটি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে তারই এক বন্ধুর বাড়ি গেছেন। আমন্ত্রিত ব্যক্তির উচিত অনুচিতের বোধটুকু থাকলে তা নিয়ে কোনো না কোনো ভাবে প্রকাশিত হবে। যদি দেখা যায় ঐ শোকানুষ্ঠানে তিনি খুব রঙচঙে জেল্লাদার জামাকাপড় পরে ও উৎকট সাজে সজ্জিত হয়ে উপস্থিত হয়েছেন তাহলে বুঝতে হবে তার ঔচিত্যবোধের অভাব আছে। কারণ শোকানুষ্ঠানে যে কোনো রঙ বর্জনীয়। শান্তির রঙ সাদা, আর দুঃখশোকের রঙ কালো। তাই যে কোনো শোকানুষ্ঠানে ঐ রঙের পোশাক পরিধান করাই শ্রেয়। জেল্লাদার জামাকাপড় যেহেতু শোকের পরিমণ্ডলটি নষ্ট করতে পারে তাই ঐ জাতীয় পোষাক বর্জন করাই উচিত। লৌকিক জীবনে মানুষের যেমন উচিত-অনুচিতের জ্ঞান থাকে ঠিক তেমনি অলৌকিক কাব্য জগতের স্রষ্টা। কবিদেরও এই জ্ঞানটুকু না থাকলে কাব্যরচনা ব্যর্থ হতে পারে। অর্থাৎ কোন কাব্যে কোন চরিত্র সৃজন করলে, কোন চরিত্রের মুখে কি জাতীয় সংলাপ বসালে এবং সেই চরিত্রের কি জাতীয় আচরণ দেখালে তা ঔচিত্যের হানি ঘটাবে না বা অসংগত হবে না কবির সেই বোধটুকু থাকা চাই। কেবলমাত্র চরিত্র বা আচরণের ক্ষেত্রেই নয় পদ, বাক্য, অর্থ, গুণ,

অলংকার, ক্রিয়া, দেশ, প্রতিভা, কারক, লিঙ্গ, বচন, উপসর্গ, কাল প্রকৃতির ঔচিত্য রক্ষিত হয়েছে কিনা তা দেখাও কবির কর্তব্য।

একাদশ শতকের কাশ্মীরি আলংকারিক আচার্য ক্ষেমেন্দ্র ঔচিত্যবাদকে কাব্যজগতে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন। তার বিখ্যাত 'ঔচিত্যবিচার চর্চা' গ্রন্থে তিনি রসকে প্রধান স্থান না দিয়ে ঔচিত্যকে প্রধান স্থান দেন। তিনি বলেছিলেন যে, লোকে রসকে কাব্যের আত্মা বললেও ঔচিত্যই হল সেই রসের প্রাণ। ক্ষেমেন্দ্র অলংকার, গুণ প্রভৃতিকে বাদ দিয়ে ঔচিত্যকে কাব্যের জীবন স্বরূপ বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। উচিত্যের অর্থ হল সদৃশতা বা সামঞ্জস্য। অর্থাৎ যার সঙ্গে যার মেলে বা খাপ খায় তাকে ঔচিত্য বলে। যেমন যে পদ যেখানে প্রয়োগ করলে সমগ্র অর্থের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য দেখা দেবে সেখানে সেই পদই প্রয়োগ করা দরকার । অলঙ্কার প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, উচিত স্থানে বিন্যাস করলেই অলঙ্কার দেহকে অলঙ্কৃত করতে পারে। এবং উচিত স্থান থেকে বিচ্যুত গুণগুলিকেও গুণ বলা যায় না। কণ্ঠে মেখলা বা কোমরবন্ধন পরলে এবং নিতম্বে হার পরলে সেই অলংকারের কোনো মর্যাদা থাকে না। বীরত্ব একটি গুণ হলেও ভীত ব্যক্তির মধ্যে সেই গুণের প্রকাশ ঘটানো হাস্যকর। তেমনিভাবে কোনো নাট্যকার যদি প্রবল পরাক্রান্ত কোনো রাজার চিত্র অঙ্কন করেন তবে তিনি তার এমন কোনো আচরণ দেখাবেন না যেটা অসংগত ও অসম্ভব। যেমন যদি নাট্যকার দেখান রাজা যুদ্ধে গিয়ে বিপক্ষ সৈন্য দলের সাতটা হাতিকে একা পাঁজাকোলা করে তুলে সাত হাত দূরে ছুঁড়ে ফেললেন,তবে সেই বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে ও ঔচিত্যের সীমা পেরিয়ে যাবে। মনে রাখা দরকার যে রাজা যত পরাক্রমী বীরই হোন না কেন তিনি মানুষ। তার পক্ষে ঐ জাতীয় অমানুষিক আচরণ সম্ভব নয়। আবার মহাকবি কালিদাস যখন 'কুমারসম্ভব' কাব্যে হরপার্বতীর শঙ্গারের বর্ণনা করেছেন তখন তা গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হয়নি। কারণ গ্রাম্য শৃঙ্গার রসের পরিবেশন দেবদেবীর শৃঙ্গার বর্ণনার ঔচিত্য হানি ঘটাতে। কালিদাস মহৎ কবি ছিলেন বলেই তার কাব্যে ঔচিত্য হানি ঘটেনি।

উন্নত চরিত্রে যেমন পান্ডিত্য শোভা পায়, তেমনি কোনো মহাকাব্যের মধ্যে বাক্যগুলি যদি এমনভাবে রচিত হয় যাতে বর্ণনীয় বিষয়টি সমুচিত ভাবে নিজেকে সপ্রমাণ করে

তোলে বা প্রাণময় হয়ে ওঠে তাহলে তাকে বাক্যের ঔচিত্য বলা যেতে পারে। যথোপযুক্ত বিশেষণ দিলে প্রবন্ধের ঔচিত্য সাধিত হয়। যেমন যক্ষ যখন মেঘকে প্রিয়ার কাছে দূত করে পাঠানোর পরিকল্পনা করেন তখন তিনি তাকে নানা বিশেষণে ভূষিত করেছিলেন। ক্ষেমেন্দ্র বলেছিলেন, কাব্যের মধ্যে রসের উপযুক্ত বাক্যবিন্যাস হলে তাকে শুনেছিত বলে। রসের অনুকুল কিংবা অর্থের অনুকুল পদের ব্যবহারকে 'অলঙ্কারৌচিত্য' বলে। ক্ষেমেন্দ্র কোন রসের সঙ্গে কোন রসের মিলনে রসৌচিত্য হয় তার ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন কোন রসের সঙ্গে কোন রসের মিলন সম্ভবপর। ক্ষেমেন্দ্রের

ঔচিত্য বিষয়ক আলোচনায় কারকৌচিত্য, লিঙ্গৌচিত্য, বচনৌদিত্য, বিশেষণৌচিত্য, উপসর্গৌচিত্য, নিপাতৌচিত্য, কালৌচিত্য,দেশৌচিত্য, কুলৌহিত্য, ব্রতৌচিত্য, তত্ত্বৌচিত্য, অভিপ্রায়ৌচিত্য, স্বভাবৌচিত্য, সারসংগ্রহৌচিত্য, প্রতিভৌচিত্য, অবস্থৌচিত্য, নামৌচিত্য প্রভৃতি ঠাঁই পেয়েছিলো। ঔচিত্যই যে কালের প্রাণ ক্ষেত্রে তা জোরের সঙ্গে ঘোষনা করেন।

কুন্তকও ঔচিত্য বিষয়ে কিছু মূল্যবান কথা বলেছেন। তিনি তার 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থে উত্তম কাব্যের দুটি গুণ থাকা আবশ্যক বলে মনে করেছিলেন। এই দুটি হল ঔচিত্য ও সৌভাগ্য। যেখানে বর্ণনীয় বিষয়ের স্বরূপটি কবির পরিকল্পনার দ্বারা বা কবি-পরিকল্পিত বা বা শ্রোতার স্বভাবের দ্বারা একটি নতুন মাহাত্মে বা উৎকর্ষে মণ্ডিত হয় সেখানে ঔচিত্য হয়। কুন্তক ঔচিত্য বোঝাতে গিয়ে "রঘুবংশম" থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ।

"শরীরমাত্রেণ নরেন্দ্র তিষ্ঠন

আভাসি তীর্থপ্রতিপাদিতর্দ্ধিঃ

আরন্যকোপাত্তফল প্রসূতিঃ

স্তম্বেন নীবার ইবাবশিষ্ট

অর্থাৎ

যোগ্য পাত্রে করি দান বিভব তোমার,

হে রাজন, আজি তুমি দেহমাত্র সার।

নীবার স্তবক হতে ধান্যের সম্ভার।

বনবাসী নিলে যথা বৃন্ত শোভে তার।

রঘুবংশের এই শ্লোকে মুনি নিজের চরিত্রানুগভাবে ও নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজাকে বর্ণনা করেছেন। নীবার তৃণধান্য যেমন তার সমস্ত ধান অপরকে বিলিয়ে দিয়ে নিজের বৃন্তটি নিয়ে শোভা পায়, তেমনি নরশ্রেষ্ঠ রাজা তার সমস্ত ধন সংপাত্রে পান করে কেবল দেহখানি নিয়ে শোভা পাচ্ছেন। এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মুনি তার অভিজ্ঞতার পরিধি থেকে রাজাকে বর্ননা করেছেন। মুনি রাজাকে এমন কিছুর সঙ্গে তুলনা করেননি যে অভিজ্ঞতার শরিক মুনি নন। এমনটা হলে ঔচিত্য দোষ ঘটতে পারতো। এই যে দেশ, কালশ্রোতা প্রভৃতির অনু ,বক্তা ,রূপভাবে বিষয়বস্তুকে দেখা, কুন্তক একেই ঔচিত্য বলেছেন।

আলংকারিক মহিমভট্ট ঔচিত্যকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—শব্দৌচিত্য এবং অর্থৌচিত্য। বিভাব, অনুভাব, ভাব যদি রসের আনুকুল্য না করে তাহলে সেখানে অন্তরঙ্গ বা অর্থানৌচিত্য হয় । আর শব্দবিন্যাসের অপটুত্ব বা ত্রুটি জনিত কারণে রসের অভিব্যক্তির ব্যাঘাত ঘটলে বহিরঙ্গ বা শব্দনৌচিত্য হয়। মহিমভট্ট অনৌচিত্যকে কাব্যের দোষ বলে স্বীকার করেছেন; কিন্তু আনন্দবর্ধন অনৌচিত্য মাত্রই রসপ্রতীতির ব্যাঘাত, এ কথা মানতে রাজি ছিলেন না। আনন্দবর্ধনের আলোচনায় কেবল অন্তরঙ্গ বা অর্থনৌচিত্যই গুরুত্ব পেয়েছিল কিন্তু মহিমভট্ট অনৌচিত্য বলতে রসপ্রতীতির ব্যাঘাত ছাড়াও শব্দ ব্যাপার জনিত দোষকে বুঝেছিলেন। মহিমভট্টের আলোচনায় শব্দানৌচিত্যই বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল।

শব্দানৌচিত্য বলা হল এই কারণে যে মহিমভট্ট ঔচিত্যকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করলেও আলোচনার সময় ঔচিত্য অপেক্ষা অনৌচিত্যকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

আনন্দবর্ধন অর্থৌচিত্যের বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন বলে মহিমভট্ট তার আর পুনরাবৃত্তি করেননি।

আলংকারিক ভোজ তার 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' এ ঔচিত্য সম্পর্কে অতিসংক্ষেপে আলোচনা করেছিলেন। ভোজ ঔচিত্যের আলোচনাকে রীতি ও ভাষার অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন। তিনি ছয় প্রকারের ঔচিত্যের কথা বলেছিলেন—বিষয়ৌচিত্য, বাচৌচিত্য, দেশৌচিত্য, সময়ৌচিত্য, বক্তৃবিয়ৌচিত্য ও অর্থৌচিত্য। ভোজের ঔচিত্য বিষয়ক আলোচনায় বেশ অভিনবত্ব আছে। যেমন বাচ্যৌচিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষা ব্যবহারের ঔচিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া দেশ অনুসারে ভাষার পার্থক্য, সময়ানুযায়ী ভাষার ব্যবহার, বস্তুর মান ও স্তর অনুযায়ী ভাষার ব্যবহার এ বিষয় অনুযায়ী গদ্য ও পদ্যের

ব্যবহার ভোজের ঔচিত্য-বিষয়ক আলোচনায় ব্যাখ্যাত হয়েছিল। তবে ভোজ ঔচিত্যকে কখনই কাব্যাত্মা বলেননি।

'কাব্যানুশাসন' গ্রন্থের রচয়িতা হেমচন্দ্রও ঔচিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। দোষ এবং গুণের অঙ্গীভূত করে ঔচিত্যের আলোচনা করার জন্যে তার আলোচনায় ঔচিত্যের প্রাধান্য অনেকটা খর্ব হয়েছে। তিনি বক্তা, বিষয় ও রচনা—এই তিনের মধ্যে, ঔচিত্যের অনুসন্ধান করেছেন। আনন্দবর্ধন ও অভিনব গুপ্ত ঔচিত্য, অনৌচিত্য নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। আনন্দবর্ধন রসসৃষ্টির দিক থেকে ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বিচার করেছেন। তিনি বলেছিলেন, 'অনৌ*চিত্য* ছাড়া রসভঙ্গের *কোনো কারণ নেই।*' অর্থাৎ যে রচনায় ঔচিত্য রক্ষিত হয় সেই রচনা রস সৃষ্টিরও সহায়ক হয়। অনৌচিত্যই একমাত্র রসের অপরিপোষকতা করে। আনন্দবর্ধন কবিকর্ম বলতে কাব্যে রসের অভিব্যঞ্জনার উপযোগী করে ঔচিত্য অনুযায়ী বাচ্য ও বাচকের (শব্দ ও অর্থের) যোজনাকে বুঝেছিলেন। কাব্যে শব্দ, অর্থ, রীতি,অলংকার গুণ এ সবকিছু বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হল এরা রসসৃষ্টিতে কতটা সহায়ক হয়েছে। এই ঔচিত্য তত্ত্বই হল রসতত্ত্বের পরম উপনিষৎ। চিত্যের আলোকে অর্থ, রীতি, অলংকার, গুণ ইত্যাদি সবকিছুই বিচার্য কারণ এগুলি শেষ পর্যন্ত রসসৃষ্টিরই আনুকূল্য করে। অনুরূপভাবে

বিচার্য কাব্যে চিত্রিত চরিত্রগুলি। চরিত্রানুযায়ী তাদের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে না পারলে ঔটিত্যের ব্যাঘাত ঘটে। তাই কোনো মহৎ চরিত্রে কোনো নীচভাবের আরোপ প্রত্যাশিত নয়। দেবদেবীর প্রসঙ্গ বর্ণনায় গ্রাম্য শৃঙ্গারের আরোপ রসভঙ্গ ঘটাতে পারে। একটি রসের বর্ণনা করতে গিয়ে বিরুদ্ধ রসের বর্ণনা প্রত্যাশিত নয়। এই বিষয়ের আলোচনার পুনরাবৃত্তি ঔচিত্যহানি করে ও রসমষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটায়। আকস্মিক ভাবে কোনো রসের বর্ণনা কিংবা প্রত্যাশিত বর্ণনীয় বিষয় হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া এসবই রসভঙ্গ করে বলে সবই ঔচিত্য বিরোধী কাজ। আনন্দ বর্ধনের কাছে কোনো রচনার রস বৃদ্ধি হয়েছে না রসভঙ্গ হয়েছে—তা বিচারের একমাত্র মানদণ্ড রচনাটিতে সর্ববিষয়ে ঔচিত্য রক্ষিত হয়েছে কিনা। এইভাবে আমরা দেখি আনন্দবর্ধনের ঔচিত্য বিষয়ক আলোচনাই হল রসের সার্থকতা ও অসার্থকতা বিষয়ক আলোচানা।

মনে রাখা দরকার যে কোনো কবি বা সাহিত্যিক ঔচিত্যের পাঠ নিয়ে কাব্য রচনায় অবতীর্ণ হন না। কবিতা হল তার অনুভূতির স্বতঃশর্ত প্রকাশ। কবির অনুভূতিকে প্রকাশের জন্য কবিকে যেমন পৃথকভাবে যত্নশীল হতে হয় না ঠিক তেমনি কোন জাতীয় রচনায় কি জাতীয় শব্দ ও অলঙ্কার ব্যবহৃত হবে, কোন রীতিতে লিখলে রচনা সার্থক হবে, চরিত্রে কোন স্বভাব যুক্ত হলে চরিত্রটি সৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটাবে না, বিষয়ের উপযোগী ভাষা কি হবে, সময়োপযোগ্য কোন ভাষা ব্যবহার করলে রচনা সার্থক হবে এ সব ঔচিত্যবোধ প্রতিভাধর কবির মধ্যে আপনা

আপনি এসে পড়ে। তাই যে কোনো শ্রেষ্ঠ কবির রচনাই রসের পরিপোষক হয়। ঔচিত্যের প্রতি অতিমাত্রায় যত্নশীল ও সচেতন থেকে কতটা সার্থক কাব্য রচিত হতে পারে সে প্রশ্ন তাই থেকেই হয় । উচিত্যের প্রতি

পৃথকভাবে যত্নশীল হতে হয় না; ঔচিত্যবোধ শ্রেষ্ঠ কবির স্বতঃস্ফূর্ত ধর্ম।

৫.৩ অনুশীলনী

১।বক্রোক্তিবাদ কাকে বলে?

২।কুন্তকের বক্রোক্তিবাদ এর মূলকথা গুলি আলোচনা করো।

৩।কুন্তকের বক্রোক্তিবাদ এর পরিচয় দিয়ে এই মতবাদের আধুনিকতা ব্যাখ্যা করো।

৪।ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের ঔচিত্যবাদ সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫.৪ গ্রন্থপঞ্জী

১। ধ্বন্যালোক- সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত

২। কাব্যলোক- সুধীর কুমার চক্রবর্তী

৩। কাব্য জিজ্ঞাসা- অতুলচন্দ্র গুপ্ত

৪। কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা - অচিন্ত্য বিশ্বাস

৫। ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব - অবন্তীকুমার সান্যাল

একক ৬ - অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব

বিন্যাসক্রম

৬.১ অ্যারিস্টটলের জীবনী

৬.২ ‘পোয়েটিক্স' গ্রন্থটির সামগ্রিক পরিচয়

৬.৩ অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স গ্রন্থের দ্বারাই ইউরোপীয় সাহিত্য সমালোচনার সত্রপাত

৬.৪ ষড়ঙ্গ শিল্পের অঙ্গ

৬.৫ ‘প্লটই ট্রাজেডির আত্ম, চরিত্র গৌণ'

৬.৬ ট্রাজেডির নায়ক চরিত্র

৬.৭ অনুশীলনী

৬.১ অ্যারিস্টটলের জীবনী

অ্যারিস্টোটলের মানব মনীষার এক অপূর্ব বিস্ময় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান দর্শন রাজনীতি ও সাহিত্য নিয়ে তার জিজ্ঞাসার অন্ত ছিল না যে বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করছেন তার উপরে তিনি আলোকপাত করেছেন তার ছিল এক বিশ্বজনীন মনীষা। কোন দুরূহ বিষয় নিয়ে তিনি সংসদে আলোচনা করতে পারতেন। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করে তিনি তার মূল অনুসন্ধান করেছেন ও তার সংজ্ঞা এবং নীতি নির্ধারনের চেষ্টা করেছেন। তিনি যে শেষ কথা বলে গেছেন সেই অর্থে তাকে গ্রহণ করলে ভুল

করা হবে। টি এস এলিয়েটের বিষয়ে আমাদের সতর্ক করে বলেছেন

One must be firmly distrustful of accepting Aristotle in a canonical spirit ,this is to lose the whole living force of him.

তিনি যে কোনো আইন প্রণয়ন করেছেন তা সত্য নয় অথবা তিনি বিজ্ঞান দর্শন ও সাহিত্য সম্পর্কে চরম কথা বলে যাননি। তার বড় দান হলো তিনি আমাদের মধ্যে ঔৎসুক্য ও প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছেন। বিচিত্র সৃষ্টি যেমন একদিকে মনে বুদ্ধিবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছে সৌন্দর্যপিপাস তৃপ্তি করেছে তেমনি তা আবার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা চিত্রকে প্রবুদ্ধ করেছে। তার পোয়েটিকস গ্রন্থের সার্থকতা এখানেই যে তা পাঠকের কাব্যজিজ্ঞাসা পূর্ণ করে। ট্রাজেডি নিয়ে পরবর্তীকালে অনেক আলোচনা হয়েছে। অ্যারিস্টোটলের মতবাদ বিভিন্ন যুগে আলোচিত সংশোধিত সম্প্রসারিত হয়েছে কিন্তু যে মূল তত্ত্ব প্রতিষ্ঠানকে জিজ্ঞাসায় আন্দোলিত করেছে। তার বক্তব্য এত গভীরে বর্তমানকালেও তার মূল্য বিচার করা হয়ে থাকে। তার সমালোচনায় এটা বলা হয়ে থাকে যে তিনি অসঙ্গতভাবে আখ্যানের ওপর গুরুত্ব দান করেছেন।শেক্সপিয়ার থেকে পরবর্তীকালে ট্রাজিক নাট্য সমূহ চরিত্র সৃষ্টি প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু একথা মেনে নিল আখ্যানের গুরুত্ব হ্রাস পায় না। আখ্যান অর্থে অ্যারিস্টোটল বলেছেন কার্যকারণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কাহিনী ও চরিত্র এই আখ্যানের মধ্যে সম্পূর্ণতা ও ঐক্য বর্তমান থাকবে।এটা না হলে ট্রাজেডির যে উদ্দেশ্য সেটা সফল হবেনা। জীবদেহের গঠন সুষম হলে ও পরিমিত দৈর্ঘ্য থাকলে যেমন তার সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয়ে থাকে, ট্রাজেডির আনন্দ উপভোগ করতে হলে সেইরকম গঠনের সুষম ও পরিমিত দৈর্ঘ্য থাকা অপরিহার্য। এই অর্থে তিনি বলেছেন যে কাহিনীর মধ্যে আদি,মধ্য,অন্তের ঐক্য পূর্ণতা দান করে।

অ্যারিস্টোটলের জীবনে তিনটি পর্যায় পাওয়া যায়। তিনি ৩৮৪ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব মেসিডোনিয়ার নিকটে চ্যালসিদাইস উপদ্বীপের উত্তর পূর্ব তীরে স্টাগিরা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থানের নাম অনুসারে তাকে কবি স্টাগিরাইট নামে অনেকে উল্লেখ করে থাকেন। তার সৎপিতা দ্বিতীয় আমিনটাসের চিকিৎসক ছিলেন। এ কারণে হয়তো শরীর বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন তিনি। আয়োনিয়ার

অধিবাসীগণ প্রকৃতি বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করতেন। অ্যারিস্টটলের জন্মসূত্রে স্থানীয় অধিবাসী ছিলেন।

আচার্য প্লেটো এথেন্সে অবস্থিত একাডেমিতে তিনি বিশ বছর ৩৬৭ থেকে ৩৪৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ কাটান। সতেরো থেকে সাঁইত্রিশ বছর পর্যন্ত এখানে তিনি অতিবাহিত করেন। তার চিন্তাধারা ও মানস প্রকৃতি প্লেটোর শিক্ষায় গঠিত হয়, কিন্তু যেখানে তিনি আচার্যের মত অর্জন করতে পারেননি সেখানে তিনি প্লেটো কর্তৃক উপস্থাপিত মতের উত্তর দিয়েছেন। কাব্য সম্পর্কে প্লেটোর মত অ্যারিস্টটল স্বীকার করেননি, কিন্তু তার চিন্তাধারা যে আচার্যের শিক্ষায় প্রভাবিত হয়েছিল তা মেনে নিতে হয়। প্লেটো সৎ নাগরিক জীবনের কথা চিন্তা করেছিলেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করতে হবে। আরিস্টটল গুরুর মত সামগ্রিকভাবে নাগরিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনের কথা ভেবেছেন। ব্যক্তি সমাজ জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সব প্রকার কল্যাণ সাধন করবে। ট্রাজেডির ফলশ্রুতি ব্যাখ্যা করে তিনি যেখানে বলেছেন এটি দর্শক মনে ভীতির সৃষ্টি করে, সেখানে নন্দনতত্ত্ব ছাড়াও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের কথাটি তার মনে ছিল। একাডেমিতে অংক ও জ্যোতির্বিজ্ঞান, শাসনতন্ত্র , চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হতো। প্লেটোর আদর্শে আরিস্টটল এখানে তার কথোপকথন রচনা করেন।

প্লেটোর মৃত্যুর পর তার ভাতুষ্পুত্র স্পিউসিপপাস একাডেমির অধ্যক্ষ হন। আরিস্টটল এথেনিয় হওয়ায় এই পদ লাভ করতে পারেননি। তিনি জেনোক্রিটিস সহ আসাসে যান। তিন বছর পরে তিনি লেসবসে যান। এই স্থানের সঙ্গে সাফোর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আসসে সেখানকার শাসনকর্তা হার্মিয়াসের সহায়তায় তিনি বিদ্যালয় তৈরি করেন। হার্মিয়াসের অনুরোধে ফিলিপ তার পুত্র আলেকজান্ডারের শিক্ষক রূপে আরিস্টটলকে নিযুক্ত করেন। এখানে তিনি ৩৪২ থেকে ৩৩৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সাত বছর অতিবাহিত করেন। আলেকজান্ডারের শিক্ষাভার গ্রহণ করে আর মনে সংশয় দেখা দেয়। তিনি প্লেটোর নির্দেশ অনুসারে কবি ও কাব্য সমূহ পরিহার করে সম্রাটকে দার্শনিক করার উদ্দেশ্যে নীতি ও দর্শন শিক্ষা দেবেন, না গ্রীসের ঐতিহ্য অনুযায়ী

শিক্ষার্থীকে কবিগণের কাব্যের সঙ্গে পরিচয় সাধন করাবেন এই প্রশ্ন তাঁর মনে জেগে উঠতে থাকে। মনে হয় তিনি দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করেন। তাকে তার কথোপকথনের অংশবিশেষ পাওয়া গেছে তার মধ্যে কাব্য ছন্দের উপযোগিতা সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছন। তিনি পোয়েটিক্সের প্রথম অধ্যায়ে এ সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে হোমার ও এমপিডোকলিসের মধ্যে ছন্দ ছাড়া অপর কোন সাদৃশ্য নেই। ছন্দের ওপর কাব্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে না। তা ইমিটেশন বা জীবন স্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত। পোয়েটিকসের নবম অধ্যায় তিনি বলেছেন যে ইতিহাস ও কাব্যের মধ্যে পার্থক্য এই কারণে নয় যে একটি গদ্য অপরটি ছন্দবদ্ধ কাব্যে রচিত।

তিনি বলেছেন যে হেরোডোটাস ছন্দে লিখলেও তাঁর রচনার ইতিহাস নামে খ্যাত হত। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল একটি প্রদর্শিত হয় যা সম্ভাব্য এবং অপরিহার্য রীতিতে ও অপরটি অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর পরিচয় দেয়।

অ্যারিস্টটল তার On the Poets গ্রন্থে কবিদের বিরুদ্ধে প্লেটোর অভিযোগের উত্তর দিয়েছিলেন। হার্মিয়াস পারসীকগণ কর্তৃক বন্দি হয়ে নিহত হলে অ্যারিস্টটল পারস্য রাজকে পরাভূত করে সম্রাট হওয়ার জন্য আলেকজান্ডারকে উৎসাহিত করেন। এরপর তিনি লাইসিউমে আপোলোর নামে উৎসর্গীকৃত কুঞ্জে তার নিজস্ব বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান আরম্ভ করেন। এটি ৩৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে শুরু হয়। এখান থেকে তার জীবনে তৃতীয় পর্বের সূচনা।

দ্বিতীয় পর্বের শেষ ভাগে তিনি গ্রীক কাব্যের ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি তার ভাতুষ্পুত্র কালিসথিনিস এর সহায়তায় পাইথিয়ান ও অলিম্পিক ক্রীড়ার বিজয়ীদের তালিকা প্রস্তুত করেন। পাইথিয়ান প্রতিযোগিতায় সঙ্গীত, কাব্য, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হত। এরপরে তিনি এথেনীয় নাটকের সংকলন করেন। তিনি

১৫৮ টি শাসনতন্ত্রের আলোচনা করেন। আলেকজান্ডারের যুদ্ধকালে তিনি প্রকৃতি-বিজ্ঞানের যে সকল উপাদান পান তা ব্যবহার করে Historia Animalium রচনা করেন।

এথেন্সে ফেরার পর তিনি অ্যাপোলোর পবিত্র কুঞ্জে তার বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এরপর লাইসিউমে বৃত্তাকার পথে ছায়া সুনিবিড় পথে চলতে চলতে শিক্ষাদান করতেন। তার বিদ্যালয় পেরিপেটিক স্কুল নামে অভিহিত হয়। এখানে তিনি অন্তরঙ্গদের সঙ্গে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। এই পর্বে তিনি অলংকার ও রাজনীতি জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করতেন। এই পর্বে তিনি অলংকার ও poetics রচনা করেন।লক্ষ্য করার বিষয় যে কমেডি নিয়ে তিনি বিশদ আলোচনা করেননি। পোয়েটিকস ষষ্ঠ অধ্যায় এই আলোচনা বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেও তা পাওয়া যায় না। সম্ভবত poetics র দ্বিতীয় খন্ড রচিত হয়েছিল সেখানে কমেডি বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল কিন্তু সে গ্রন্থ আমরা পাইনা। ড্রাইডেন তার An Essay of Dramatic Poesyতে তা উল্লেখ করেছেন। লিরিক নিয়ে তিনি কোন আলোচনা করেননি। ইডিপাস নাটকে কোরাসের গীতির মাধ্যমে লিরিকের সুর প্রকাশিত হয়েছে তেমন নায়কের মৃত্যু বর্ণনাতে গভীর আবেগ ব্যক্ত হয়েছে।

৩২৩ খ্রিস্টপূর্বে আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর অ্যারিস্টটলের জীবনে গভীর দুর্যোগ নেমে আসে। বিদ্রোহ ঘোষণা করে বিদ্রোহ দমনের জন্য পরবর্তী শাসক এলিস্পেতারের অভিযান ব্যর্থ হয়। অ্যারিস্টটল কাল্কিসে উপনীত হন ও সেখানে তার মৃত্যু হয়। ৩২২ খ্রিষ্টপূর্বে তিনি মারা যান। তিনি প্রকৃত গ্রীক মনের অধিকারী ছিলেন। তার জ্ঞান তৃষ্ণার শেষ ছিলনা। টেনিসন তার ‘ইউলিসিস’ কবিতায় গ্রীক পরিচয় ব্যক্ত করেছেন। অ্যারিস্টোটল বলেছেন

‘The more I find by myself and alone, the more I have become a lover of myth.’

গভীর ধ্যান এর মাধ্যমে তিনি এই দিব্যদর্শন লাভ করেছিলেন।

তিনি ন্যায়শাস্ত্র বা লজিক বিষয় তাঁর রচনার অর্গান নামে সংকলিত করেছিলেন। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি বিষয় আলোচিত হয়েছে

Analytics or logic

The categories

The topics

Sophistic Elenchi

Prior and Posterior Analytics

৬.২ 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থটির সামগ্রিক পরিচয়

খ্রীস্টপূর্ব ৩৮৪ অব্দে ম্যাসেডোনিয়ার অন্তর্গত স্ট্যাসাইরা শহরে অ্যারিস্টটলের জন্ম। পিতা নিকোম্যাকাস ছিলেন রাজ দরবারের বিশিষ্ট চিকিৎসক। মাত্র ১৭ বছর বয়সে অ্যারিস্টটল এথেন্স নগরীতে গিয়ে প্লেটোর অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হন। ২০ বছর সেখানে থেকে তিনি বিদ্যাচর্চা করেন। এরপর কিছুদিনের জন্য এথেন্স ত্যাগ করলেও খ্রীস্টপূর্ব ৩৩৫ অব্দে আলেকজান্ডারের রাজত্বকালে তিনি আবার এথেন্সে ফিরে আসেন এবং নিজস্ব শিক্ষাকেন্দ্র লাইসিয়াম' প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৩২২ অব্দে তার মৃত্যু হয়। অ্যারিস্টটল একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা। এথিক্স, পলিটিক্স, রেটোরিক, পোয়েটিক্স প্রভৃতি। তার পোয়েটিক্স গ্রন্থটি অধিক বয়সের রচনা। অবশ্য এটি সেই অর্থে রচনাও নয়,তার বক্তৃতার নোটস্ মাত্র। তাই পোয়েটিক্স-এর বিষয়বস্তু বিক্ষিপ্ত, অবিন্যস্ত এবং অসম্পূর্ণ।

পোয়েটিক্স গ্রন্থটি সর্বমোট ২৬টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। পরিচ্ছেদগুলির বিষয়বস্তুর নিম্নরূপে

প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে যথাক্রমে অনুকরণের মাধ্যম, অনুকরণের বিষয়বস্তু এবং অনুকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিষয়বস্তু কাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, প্রসঙ্গত এসেছে ট্রাজেডির বিষয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে কমেডি সম্পর্কে আলাোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত ট্রাজেডির সঙ্গে মহাকাব্যের পার্থক্যটি দেখনো হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় ট্রাজেডির সংজ্ঞা ও স্বরূপ।

সপ্তম পরিচ্ছেদে কাহিনির প্রকৃতি।

অষ্টম পরিচ্ছেদে কাহিনির ঐক্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নবম পরিচ্ছেদে কাহিনি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একটু খাপছাড়াভাবে কাব্য সত্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক সত্যের তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

দশম পরিচ্ছেদে পুনরায় কাহিনির বৃত্তগঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এগারো পরিচ্ছেদে কাহিনির বিপরীত মুখীনতা সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

বারো ও তেরো পরিচ্ছেদে পুনরায় ট্রাজেডির বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে আলোচনা লক্ষ্য করা যায়।

চোদ্দ পরিচ্ছেদে বহু আলোচিত করুণা ও ভয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পনেরো পরিচ্ছেদে আলোচ্য বিষয় চরিত্র।

ষোল পরিচ্ছেদে বস্তুধর্মের রহস্য আবিষ্কারের রীতি আলোচিত হয়েছে।

সতেরো ও আঠারো পরিচ্ছেদে ট্রাজেডি রচনার নীতি ও নিয়ম সম্পর্কে নির্দেশ হয়েছে।

উনিশ, কুড়ি, একুশ, বাইশ পরিচ্ছেদগুলিতে যথাক্রমে রচনারীতি, বাগভঙ্গী, ছন্দ অলঙ্কার সম্পর্কে নির্দেশ রয়েছে।

তেইশ, চব্বিশ, পঁচিশ পরিচ্ছেদে মহাকাব্য সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

ছাব্বিশ পরিচ্ছেদে মহাকাব্যের সঙ্গে ট্রাজেডির তুলনা।

পোয়েটিক্স প্রাচীন গ্রীক ভাষায় রচিত। এখানে এমন কিছু শব্দ রয়েছে যার প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ইংরাজি ভাষায় বুচার (১৮৯৫-৯৬), বাই ওয়াটার (১৯৯০) এবং মারগোলিওথের (১৯১১) অনুবাদগুলি

বিখ্যাত। বাংলা ভাষায় যে কয়েকটি অনুবাদ হয়েছে তার সবগুলিই ইংরাজি ভাষা থেকে। প্রথম অনুবাদের

কৃতিত্ব ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের। পরবর্তীকালে ভবানী গোপাল স্যান্নাল, সুবোধ সেনগুপ্ত, শিশির দাস,

শীতল ঘোষ এবং নির্মল সাহার অনুবাদ খ্যাতি অর্জন করেছে।

৬.৩ অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স গ্রন্থের দ্বারাই ইউরোপীয় সাহিত্য সমালোচনার সত্রপাত

অ্যারিস্টটল ছিলেন বহুমুখী জ্ঞান সম্পন্ন সার্বভৌম পণ্ডিত। বিশ্ব সাহিত্যে গ্রীসের অবদান চিরস্মরণীয়। অ্যারিস্টটল সেই গ্রীসেই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং দার্শনিক প্লেটোর ছাত্র রূপে জ্ঞানানুশীলন করেছেন। অ্যারিস্টটলের বহুপূর্বে গ্রীক নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি তার পূর্ববর্তী নাট্যকার থেসপিস, ফ্লাইনিকাস, ইস্কিলাস, সোফোক্লিস, ইউরিপিডিস প্রমুখ সৃষ্টি কর্মের সঙ্গে নিবিড় ভাবে পরিচিত ছিলেন। শুধু তাই নয়, গ্রীক নাট্যকলা, অভিনয়, মঞ্চক্রিয়া প্রভৃতি সম্পর্কেও বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। মহাকাব্য, গীতিকাব্য, ছন্দ এবং অলঙ্কার শাস্ত্র

সম্পর্কে তার ধারণা ছিল স্বচ্ছ। সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে এই স্বচ্ছ ধারণাকে কেন্দ্র করেই তিনি সমালোচনার পথটি নির্ধারণ করেছেন। সাহিত্য সম্পর্কে তার দেওয়া তত্ত্ব এবং সুত্রগুলি একান্ত ভাবেই মৌলিক এবং তার নিজস্ব উদ্ভাবন।

অ্যারিস্টটলের পূর্বে গ্রীক সাহিত্যের বিকাশ ঘটলেও সাহিত্য সমালোচনার পথটি সেভাবে নির্ধারিত হয়নি। প্লেটো সাহিত্য সম্পর্কে কিছু কিছু মন্তব্য করলেও অ্যারিস্টটল তা মেনে নিতে পারেননি। তিনি প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই কাব্য ও নাটক সম্পর্কে তার গরতুপর্ণ সিদ্ধান্তগুলি ব্যক্ত করেছেন। প্লেটো বলেছিলেন অনুকৃতির মধ্য দিয়ে

জীবনের সত্য কতখানি উদ্ঘাটিত হল দেখেই কাব্যের মূল্য নির্ধারিত হবে; অ্যারিস্টটল কিন্তু বলেন, অনুকৃতির মধ্য দিয়ে আনন্দ লাভ কতখানি হল, সেটাই কাব্যমূল্য বিচারের মাপকাঠি। প্লেটো মনে করতেন অনুকরণের বস্তু সব সময় সুন্দর হবে। অ্যারিস্টটলের মতে কুৎসিত বস্তুর অনুকরণও সুন্দর। প্লেটোর বিশ্বাস ছিল, কবিতা হল আদর্শের অনুকরণের অনুকরণ। কিন্তু অ্যারিস্টটল বলেন, ইতিহাস খণ্ড সত্য নিতে কারবার করে আর কাব্যের মধ্যে অখণ্ড ও বিশ্বজনীন সত্য প্রকাশিত হয়। তাই কাব্য জীবনের চরম সত্যকে প্রকাশ করে। প্লেটোর আলোচনায় মুখ্যত কাব্য স্থান পেয়েছিল। অ্যারিস্টটল সম্পর্কে আলোচনা পাশাপশি নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কেও বিশদ ভাবে আলোচনা করলেন। আমাদের দেশে যেমন ভরতকে, তেমনি পাশ্চাত্যে অ্যারিস্টটলকে নাট্যশাস্ত্রী বা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে,

নাটকের তত্ত্ব আলোচনায় বহু ক্ষেত্রেই এই দুই পন্ডিতের মিল রয়েছে। যেমন উভয়ে নাটক রচনার কারণ হিসাবে তাভিনয়ের কথা বলেছেন। অ্যারিস্টটল নাটকের ছয়টি অংশ নির্দেশ করেছেন, আর ভরত পাঁচটি অংশ নির্দেশ করেছেন। উভয়ের বর্ণিত অংশ মোটামুটি একই ধরনের। নাটকের ভাষা, রচনারীতি এবং অলঙ্কার নিয়েও উভয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অবশ্য ভারতের আলোচনায় নাটকের অন্যান্য দিকগুলি যেমন—প্রেক্ষাগৃহ, অভিনয়, মঞ্চরূপ, সঙ্গীত প্রভৃতির প্রসঙ্গে সে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায় তা অ্যারিস্টটলে নেই। আসলে অ্যারিস্টটল নাটককে শিল্প হিসাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য রস নিস্পত্তি। এই রসনিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত ভাবের সমাবেশ ঘটানো, যেমন শোক ভাব থেকে আসে করুণ রস। রচয়িতাকে বাস্তব জীবন থেকে ভাবগুলি গ্রহণ করতে হয়। তাই সাহিত্য (নাটক, মহাকাব্য বা গীতিকবিতা যাইহোক না কেন) হল অনুকরণীয় বিষয়। অ্যারিস্টটলের মত ভরতও এই মতটি স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন—"লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া প্রীতম।" আধুনিক সাহিত্য সমালোচকগণও সাহিত্যকে অনুকরণের বিষয় হিসাবে স্বীকার করেছেন।

আধুনিক নাট্য-সমালোচকগণ প্লটের উপরে চরিত্রকে স্থান দিয়েছেন। অ্যারিস্টটল অবশ্য প্লটকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। দুটি উপাদানের এই স্থান পরিবর্তন কিন্তু অ্যারিস্টটলের মৌলিক তত্ত্বকে কোন ভাবেই ক্ষুন্ন করেনি। এছাড়াও সংলাপ, চিন্তন, দৃশ্যসজ্জা প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি যে সকল মত দিয়েছেন, তা হয়তো এই আড়াই হাজার বছর পরে স্বাভাবিক কারণেই কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু একেবারে অস্বীকৃত হয়নি। অ্যারিস্টটল বিরোধী নাট্য সমালোচকদের মধ্যে ব্রেখট এর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন দর্শক যখন অভিনেতাদের সমান মানসিকতা লাভ করে, তখনই তার মধ্যে ভয় ও করুণার ভাব জাগ্রত হয়। পরে এই দুটি ভাব হৃদয় থেকে নিষ্কাষিত হয়ে গেলে দশকি এক নির্মল আনন্দ লাভ করে। ব্রেখট ভয় ও কণা। সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলেননি। তিনি শুধু আপত্তি করেছেন অভিনেতাদের সঙ্গে দর্শকের সম-মানসিকতা হয়ে যাওয়া নিয়ে অর্থাৎ এখানেও অ্যারিস্টটলের সুত্রকে অস্বীকার করা হয়নি।

পরিশেষে আমরা বলবো অত্যাধুনিক নাট্যকলা বা 3rd Theater-এর কথা। অ্যারিস্টটল যে আদি-মধ্য-অন্ত বিশিষ্ট কাহিনির কথা বলেছিলেন 3rd Theater-এর নাট্যকারগণ এই কাহিনি ঐক্যকে স্বীকার করতে চাননি। বাংলা নাটকে বাদল সরকার-এর "এবং ইন্দ্রজিৎ নাটকে এই রূপকল্প দেখা যায়। যুগগত প্রয়োজনে সাহিত্যের আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমালোচনার ধারায় অ্যারিস্টটল যে ভিত্তি প্রস্তর নির্মাণ করেছিলেন তাকে অস্বীকার করার কোন পথ নেই।

৬.৪ ষড়ঙ্গ শিল্পের অঙ্গ

Poetics-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে অ্যারিস্টটল Tragedy-র সংজ্ঞা দিয়েছেন। অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ তার অনুবাদে যা বলেছেন তা এইরূপ "ট্রাজেডি হল একটি গম্ভীর, সম্পূর্ণ। বিশেষ আয়তন বিশিষ্ট ক্রিয়ার অনুকরণ, ভাষার সৌন্দর্যে তার প্রতিটি অঙ্গ স্বতন্ত্র, এই টির প্রকাশ রীতি বর্ণনাত্মক নয়, নাটকীয়; আর এই ক্রিয়া ভীতি ও

করুণার উদ্রেক করে এবং তার মধ্য দিয়ে অনুরূপ অনুভুতিগুলির পরিশুদ্ধি ঘটায়।" শিশিরবাবু মূল গ্রীক সংজ্ঞার অনুসরণ করে এই সংজ্ঞাটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন বলে এর বাক রীতি কিছুটা কঠিন। তাই আমরা সহজ করে নিয়ে বলব, একটি গম্ভির,সম্পূর্ণ ও বিশেষ আয়তন বিশিষ্ট ঘটনার অনুকরণ হচ্ছে ট্রাজেডি; এটি নানান রকম অলংকার বহুল ও মনোহারী ভাবভঙ্গিতে লিখিত হবে। বর্ণনামূলক না হয়ে নাট্যগুণ সম্পন্ন হবে ও এমনভাবে লিখিত হবে যে হৃদয়ে করুণা ও ভয়ের সৃষ্টি করে এইসব বৃত্তি সমূহের পরিশুদ্ধি ঘটাবে।

অ্যারিস্টটল ট্রাজেডির যেমন পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দিয়েছেন, তেমনি এর বৈশিষ্ট্যগুলিও বিশদ আলোচনা করেছেন। তাকে অনুসরণ করে বলা যায়, ট্রাজেডি গঠিত হয় ছ'টি উপাদানে যথা কাহিনি, চরিত্র, রচনারীতি, অভিপ্রায়, দৃশ্য ও সঙ্গীত। এই উপাদানগুলির দুটি হল অনুকরণের মাধ্যম, একটি হল অনুকরণের রীতি, আর অবশিষ্ট তিনটি অনুকরণের বিষয়। অন্যদিক থেকে বলা যেতে পারে, অ্যারিস্টটল তার ট্রাজেডির উপাদানকে দুটি ভাগে বিভক করেছেন বহিরাকি উপাদান (ভাষা, সঙ্গীত ও দৃশ্য) ও অন্তরাচ্ছিক উপাদান (কাহিনি চরিত্র ও অভিপ্রায়)। আধুনিক সাহিত্যে ট্রাজেডির কিছু বিবর্তন ঘটলেও কোন কবি-সাহিত্যিক এই দুটি উপাদানের বাইরে যেতে পারেননি। সুতরাং এই উপাদানগুলির সম্পর্কে বিশন আলোচনা করা প্রয়োজন। ট্রাজেডির প্রথম ও প্রধান উপাদান কাহিনি বা Plot। ট্রাজেডি একটি ক্রিয়ার অনুকরণ। সেই ক্রিয়াটি পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ, অর্থাৎ আদি-মধ্য-অন্ত বিশিষ্ট। কাহিনি ছাড়া ট্রাজেডি দাঁড়াতে পারেন। সুতরাং অ্যারিস্টটল যে Plot-কে ট্রাজেডির আত্মা বলেছেন তা যথার্থ।তিনি বলেছেন--The incident and the plot are end of a trageady. কাহিনিকে তিনি আবার দুটি ভাগে বিভক্ত। করেছেন। যথা—জটিলতা সৃষ্টি পর্ব বা Complication এবং গ্রন্থি বা জটিলতা উন্মোচন পর্ব বা Denouement। ঘটনার সূচনা থেকে নায়কের ভাগ্য পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত জটিলতা সৃষ্টি পর্ব। আর ভাগ্য পরিবর্তনের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত জটিলতা উন্মোচন পর্ব। সমালোচক ড্রাইডেন তার An essay of dramatic poesy-এ জানিয়েছেন অ্যারিস্টটল নাট্যবৃত্তকে চার ভাগে বিভর করেছেন যয়া—Protasis বা চরিত্রগুলির পরিচয় পর্ব, Epitasis বা নাট্য

ঘটনার জটিলতা সৃষ্টি পর্ব, Catastasis বা আশাভঙ্গের পর্ব এবং Catastrophe বা বৃত্ত সমাপ্তির অংশ। কিন্তু এরূপ বিভাজন কোনো উল্লেখ 'Poetics' গ্রন্থে পাওয়া যায়নি। অ্যারিস্টটল কাহিনিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—সরল ও জটিল। যেখানে কাহিনি ধারা অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ ঘটনাক্রম কার্য-কারণের সহ সম্পর্কে আবদ্ধ এবং যেখানে বৈপরীত্যের অবকাশ থাকে না, তাই হল সরুল কাহিনি। আর নাইকেল বৃত্তে বৈপরীত্য সুচীত হয়, নায়কের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন দেখানো হয়, তখন হয়ে ওঠে জটিল কাহিনি।

Tragedy-র কাহিনি বিয়োগান্তক হবে এমন কথাসারিস্যাল বলেননি। তিনি বলেছেন, An action of destructive (Or painul nature। অর্থাং বিনে হোক বা না হোক, কাহিনিকে কিন্তু করুণ রসাত্মক হতেই হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে কাহিনী আদি-মধ্য-অন্ত বিশিষ্ট। এই ঐক্যকে বজায় রাখার জন্য তিনি যে বিশ্লেষণ করেছেন, আমরা ঘটনাগত ঐক্যের পাশাপাশি স্থান ও কালগত ঐক্যের সম্পর্ক অনুধাবন করতে প্রসঙ্গে আলোচনা শেষ করার পূর্বে আমরা একথা বলে নিতে চাই যে, পরবর্তীকালে তার এই মত সর্বজনের স্বীকৃতি পায়নি। বর্তমানে কাহিনির থেকে চরিত্রকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

কাহিনির পরে অ্যারিস্টটল চরিত্রকে স্থান দিয়েছেন। Poetics এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সংজ্ঞায় তিনি বলেছেন, "By character, I mean that, in virtue of which we ascribe certain qualities to the agents" চরিত্র হল মানুষের উপর আরোপিত গুণাবলী। বিশ্বজগতের একটি ভয়ঙ্কর, বিষাদময় ও গাণ্ডীর প্রকৃতির ঘটনা অবলম্বনে ট্রাজেডি রচিত হয়। সুতরাং ঘটনার ভূমিকা মুখ্য। কিন্তু ঘটনা মানে কালোর জীবনের বা কোন কিছু বিষয়ের সঙ্গে জড়িত একটি চলমান ব্যাপার। বিষয়কে অর্থাৎ অদডবশুকে অবলম্বন করে যখন কোনো ঘটনা ঘটে, তখন তার চরিত্র বস্তু বিশ্বের অসংখ্য বিষয় অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু ঘটনা যখন সচল মানব জীবনকে অবলম্বন করে কেন্দ্রিভূত হয় তখন সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা বাকি সম্প্রদায়-নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, তরুণ-তরুণী, বালক-বালিকা এবং এমনকি একটি মৃতদেহও কাহিনিতে

প্রাধান্য। লাভ করতে পারে। এরকম ব্যক্তি বা ব্যক্তি সম্প্রদায়ই tragedy-র চরিত্র হিসাবে গণ্য হয়।Tragedy যেহেতু গম্ভীর প্রকৃতির নাটক, তাই চরিত্রগুলিকেও হতে হবে গণ্ডীর প্রকৃতির। কাহিনিতে একাধিক চরিত্র থাকে, তার মধ্যে কোনো একটি চরিত্র সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করে। এই চরিত্রটিকে আমরা নায়ক চরিত্র হিসাবে চিহ্নিত করি। আদর্শ নায়ক চরিত্র সম্পর্কে অ্যারিস্টটল একটি সুন্দর। কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদেরই মতো দোষে-গুণে গড়া একজন সাধারণ মানুষই ট্রাজিক নায়কের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে, ষোলআনা সাধারণ মানুষ কখনো নায়ক হতে পারে না। নায়ক সাধারণের মধ্যেও অসাধারণ হবে, না হলে তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে না। অ্যারিস্টটল তার আলাোচনায় চরিত্র চিত্রণের জন্য চারটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে বলেছিলেন। প্রথমত, চরিত্রটি ভালো হওয়া চাই। ভালো মানে নাতিগত দিক থেকে ভালো। মানুষের চরিত্রের ভালোমন্দ বিচার হয় তার কথার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে। কথায় ও কাজে যে নীতি ও সঙ্গতি রেখে চলতে পারে সেই ভালো মানুষ। দ্বিতীয়ত, চরিত্রটি হবে স্বাভাবিক অর্থাৎ বিষয়ের অনুরূপ। কোনো পুরুষের মধ্যে যদি নারীর কোমলতা অথবা কোনো নারীর মধ্যে যদি পৌরুষত্বের অবস্থা লক্ষ্য করা যায়, তাহলে সেই চরিত্রটি বেমানান বলে গণ্য হবে। তৃতীয়ত, চরিত্রটি হবে বাস্তবানুগ। অর্থাৎ সাধু চরিত্র চিত্রণে সাধুত্বের প্রকাশ। ঘটাতে হবে এবং চোরের চরিত্র চিত্রণে চৌর্যবৃত্তির ভাবনা দেখাতে হবে। চতুর্থত, চরিত্রটির মধ্যে আগাগোড়া একটা সঙ্গতি থাকবে। অর্থাৎ সে ভালো হোক বা মন্দ হোক, নাটকের প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত তার মৌলরূপের কোনো রূপ পরিবর্তন ঘটবে না।

Tragedy-র তৃতীয় উপাদান হল রচনারীতি। রচনার প্রধান গুণই হল স্পষ্টতা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, অ্যারিস্টটল রীতি সম্পর্কিত আলোচনায় শুধু মাত্র শব্দ নির্বাচন ও শব্দ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, স্পষ্ট রীতি গড়ে ওঠে পরিচিত শব্দের ব্যবহারে। আর পরিচিত শব্দ মানে বিশিষ্টতাহীন শব্দ। Tragedy যেহেতু গম্ভির রচনা, তাই নিতান্তই প্রাত্যহিক শব্দকে এখানে ব্যবহার করা চলে না। কিছুটা অপরিচিত শব্দ যা আভিজাত্যময়, Tragedy-তে তাই ব্যবহার করতে হবে। বিশ্বের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের রচনা পাঠ করলে একটি বিষয় পরিষ্কার হয় যে, তারা

সহজ ভাষাকেও তাদের কাব্য সাহিত্যে অসাধারণ বানার সূঙ্গে উপস্থিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে বলেছেন, "সহজ কথা কখা যায়। না বলা সহজে।" এ কথাটা কতখানি সত্য তা বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথেরই 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থ পড়লে। কবি-সাহিকগণ তাদের বক্তব্যকে উপমা-অলংকারের সাহায্যে এমনভাবে সাজিয়ে পল যে, সাধারণ ভাষাও অসাধারণ হয়ে ওঠে। আর একথাও মনে রাখতে হবে সাহিত্যের তাটি ধারায়া ভাষা ব্যবহারের মধ্যে একটা স্বাতস্য রয়েছে। কাব্যের ভাষার সঙ্গে নাটকের ভাষা কখনো এক হতে পারে না। অ্যারিস্টটল তার আলোচনায় এই ইঙ্গিতই দিয়েছেন যে, নাটকে ভাষা হবে নাটকের উপযোগী। রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাস ও 'বিসর্জন' নাটক পাশাপাশি রেখে পড়লে অ্যারিস্টটলে এই বক্তব্যের সত্যতা অনুধাবণ করা যায়।

অভিপ্রায় হল সম্ভাব্য এবং উপযুক্ত ভাব প্রকাশের সামর্থ্য। অভিপ্রায় নাট্যকারের মননশীলতা প্রসূত সমগ্র রচনার পরিণত ও পরিপূর্ণ রূপ। কাব্য-সাহিত্য-নাটক মূলত ভাষাভিত্তিক শিল্প এবং ভাষা মানে চিন্তা-ভাবনা-অভিপ্রায়ের প্রকাশ। দৈনন্দিনের জীবনে আমরা নানান কথা বলি। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় এসব কথাগুলি হয়ত ভাবনাবিহীন। কিন্তু একথা সত্য নয়। কথা, সে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, তার পেছনে থাকে মস্তিষ্কের ক্রিয়াশীলতা। কবিতা, নাটক, গল্প বা উপন্যাস প্রভৃতি যেহেতু কল্পনার জিনিস, তাই এ সবকিছুতে যে ভাষারীতি, গঠনশৈলী, ছন্দযোজনা ও কলাকৌশল ব্যবহৃত হয়, তা সব সময় যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা প্রসত। মহৎ চিন্তাশক্তি ছাড়া মহৎ **কাজ কখনোই** সব নয়, আর একারণেই যে কোনো কালজয়ী সাহিত্যের পিছনে থাকে সাহিত্যিকের চিন্তা বা ভাবনা শক্তির প্রকাশ। নাটক মূলত দৃশ্যকাব্য। উপযুক্ত দৃশ্য যোজনা করে নাটক রচনা করতে হয়। কেননা নাটকের ঘটনাবলী অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শক সমাজ গ্রহণ করে থাকে। নাটকের প্রতিটি দৃশ্যের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক থাকা চাই। না হলে সেটি কয়েকটি দৃশ্যের সমাহার হতে পারে, যুথার্থ নাটক হতে পারে না। এই সুসম্পর্ক তৈরিই হলো নাট্যকারের অভিপ্রায়। Tragedy-র নানান স্থানে নাট্যকারের অভিপ্রায়ের দিকটি অনুমিত হয়।

অ্যারিস্টটল দৃশ্য সম্পর্কে বলেছেন, "Spectacular equipment will be a part of tragedy" বাই ওয়াটার এর অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন Stage appearance of the actors, বা মঞ্চে অভিনেতাদের উপস্থিতি। বর্তমান কালে যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে বৈদ্যুতিক মঞ্চসজ্জা, আলোক সম্পাত ইত্যাদি দৃশ্য পরিস্ফুটনে যতখানি সাহায্য করে প্রাচীন কালে বিশেষ করে গ্রীক নাটকে সে সুযোগ ছিল না। গ্রীক নাটকে দৃশ্যপটও ব্যবহৃত হত না। ফলে অভিনেতাদের রূপসজ্জা, আচার-আচরণ, উক্তি-প্রত্যুক্তি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দর্শকদের স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে বুঝিয়ে দিতে হত। এ কারণে অ্যারিস্টটল দৃশ্যের উপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভারতীয় আলংকারিকরাও নাটককে দৃশ্যকাব্য বলে অভিহিত করে থাকেন। সাহিত্যের অন্যান্য ধারার সঙ্গে নাটকের মূল পার্থক্য এখানেই। উপযুক্ত দশাসজ্জাহীন কাহিনি, তা যতই নাটকীয় হোক না কেন, নিছক বক্তৃতামালায় বা দার্শনিক তত্ত্বকথায় পরিণত হবে। মনে রাখতে হবে কাহিনি, চরিত্র বা সংলাপ নাটক হতে পারে না। কারণ এই বিষয়গুলি একটা উপন্যাসের মধ্যেও থাকে। উপযুক্ত দৃশ্য ছাড়া নাটক কখনো যথার্থ নাটক হয়ে উঠতে পারে না। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রকার ভারতমুনিও নাটকের দুটি শ্রেষ্ঠ গুণের অপূর্ব ও মনোরম দৃশ্যসজ্জা। দৃশ্যসজ্জার বাড়াবাড়িও আবার ভালো নয়। যে সমস্ত ঘটনা চোখের সামনে দেখা বা অভিনয় করা শিষ্ট রুচির পরিপন্থী তা কখনোই নাট্যদৃশ্যে দেখা উচিত নয়। যেমন ফাসির দৃশ্য, অগ্নিসংযোগ দৃশ্য ইত্যাদি। নীলদর্পণে অনেক নির্মম দশা সংস্থাপিত করা হয়েছে। অ্যারিস্টটল যাবতীয় রুচিহীন দৃশ্যকে তার আলোচনার বাইরে রেখেছেন। দৃশ্য সম্পর্কে তার মূল অভিমত হলো দৃশ্য হবে মনোরম এবং নাটকীয়।

ট্র্যাজেডিকে আনন্দদায়ক করে তোলার জন্য সঙ্গীতকে একটি অপরিহার্য উপাদান বলে মনে করেন অ্যারিস্টটল। সঙ্গীত সম্পর্কে আরিস্টটলের আলোচনা প্রাচীন গ্রীক নাটকগুলিকে বিশ্লেষণ করে। আধুনিক নাটক সম্পর্কে তার কোনো কিছু বলার অবকাশ ছিল না। কিন্তু একথাও সত্য যে, আধুনিক নাটকে সঙ্গীতের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে মনে রাখত হবে সঙ্গীত বলতে শুধু গানকে বোঝানো হয় না; বাদ্যকেও বোঝানো হয়। গ্রীকরা গীতিবাদ্যের খুব ভক্ত ছিল। তাই গ্রীক নাটকে গান-বাজনা এসেছে ব্যাপক ভাবে। গ্রীক নাটকের সঙ্গীত কোরাস' নামে অভিহিত হয়। কোরাস হল

সমবেত নৃত্যগীত। কোরাস নাট্যক্রিয়ার ভাষ্যকার। বুপে ধমীয়, নৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটাতে। পরবর্তীকালে নাটকে যে Choral character বা বিবেকের চরিত্র পাওয়া যায় তা এই কোরাসেরই বিবর্তিত রূপ। বর্তমান দিনের নাটকে "কোরাস তার গুরুত্ব হারালেও একক সঙ্গীতের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। অ্যারিস্টটল মনে করতেন Charus বা সঙ্গীত নাটকের মূল ভাবকে ব্যানায় অভিসিক্ত করে। ফ্রেডারিক শীমা সঙ্গীতকে Tragedy-র কাব্য মূল্য বৃদ্ধির সহায়ক বলে অভিহিত করেছেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ট্রাজিক নাটকগলিতে সঙ্গীতের অপরিহার্যতা আমরা অনুভব করব এই কারণেই যে, বিশিষ্ট ট্রাজেড়িগুলিতে বাদ্যধ্বনিকে কোনাোভাবেই বাদ দেওয়া যায় না বলে।

অ্যারিস্টটল ট্রাজেডি তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা। তার চিন্তার আলাোকে পরবর্তী কালে বহু মণীষী এ বিষয়ে আলাোচনা করেছেন। নতুন নতুন তত্ত্ব দিয়েছেন। কিন্তু অ্যারিস্টটলের মূল বক্তব্যকে। কেউই এড়িয়ে যেতে পারেননি।

৬.৫ 'প্লটই ট্রাজেডির আত্ম, চরিত্র গৌণ'

পোয়েটিক্স গ্রন্থের নানান স্থানে অ্যারিস্টটল কাহিনি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তার মতে কাহিনি হল ট্রাজেডির আত্মা। শ্রীক নাট্যকারগণ কাহিনির উপর যেভাবে গুরুত্ব দিতেন অ্যারিস্টটলও সেভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি অবশ্য ট্রাজেডির কাহিনিকে দুইভাবে বিভক্ত করেছেন, যথা—সরল ও জটিল। সরল কাহিনি হল-উপাখ্যান ও বর্ণনামূলক। এরকম কাহিনিতে গল্প একটি সরল রৈখিক পথে অগ্রসর হয়। এখানে কোনো রকম কোনো বৈপরীত্য থাকে না, নতুন কোনো কাহিনির উন্মোচনও থাকে না। এককথায় বলা যেতে পারে, এই ধরনের কাহিনি "যদ দৃষ্টং ত লিখিতম"। উদাহরণ হিসাবে প্রমেথিউস বাউণ্ডের নাম উল্লেখ করা যায়। অ্যারিস্টটল এই সরল কাহিনিকে আদশ ট্রাজেডি বলে মানতে রাজী ছিলেন না। তিনি জটিল কাহিনিকেই সর্বোৎকৃষ্ট ট্রাজেডি বলেছেন। জটিল কাহিনিতে বৈপরীত্য এবং উন্মোচন উপস্থিত থাকে। বৈচিত্র্য

থাকে বলেই জটিল কাহিনিতে উপকাহিনির লক্ষ্য করা যায়। যদিও কোনো কোনো উপকাহিনি রস সৃষ্টিতে সাহায্য করে, তবুও অ্যারিস্টটলের মতে উপকাহিনি অবাঞ্ছনীয়। কেবল ড্রামাটিক রিলিফের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রেও একটা উপকাহিনি দেওয়া যেতে পারে। আসলে উপকাহিনি বেশি থাকলে নাটকীয় সংঘাত ব্যহত হতে পারে। মানুষ মাত্রই অনুকরণশীল জীব। লেখক তার অভিজ্ঞতাটিকে অনুকরণ করে কার্য, নাটক ইত্যাদি লেখেন। বাস্তব জীবনের সঙ্গে এই অনুকরণের একটা সম্পর্ক থাকে। তাই কবির আবেদন পাঠক সাধারণের হৃদয়কে স্পর্শ করে। বাস্তবের বিভিন্ন বিপর্যয় কাহিনির মধ্যে গৃহীত বলেই দর্শক মনে উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা সঞ্চারিত হয়। বাস্তব জীবনে আমরা দেখি মানুষ সৌভাগ্য থেকে দুর্ভাগ্য আবার দুর্ভাগ্য থেকে সৌভাগ্যের পথে অবিরত যাতায়াত করছে। জটিল কাহিনির মধ্যে এই যাতায়াতের গতিপথটিকে কবি ধরে দিতে পারেন বলেই জটিল কাহিনি শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডি রচনার সহায়ক হয়ে ওঠে।

৬.৬ ট্রাজেডির নায়ক চরিত্র

অ্যারিস্টটল টাজেডির যে ছটি উপাদান নিদের্শে করেছেন, তার মধ্যে দ্বিতীয় উপাদানটি হল চরিত্র। কাব্যতত্ত্ব গ্রন্থের পনেরো পরিচ্ছেদে ট্রাজেডির চরিত্র সম্পর্কে তা করা হয়েছে। এখানে চরিত্র বলতে আমরা নায়ক চরিত্রকেই বুঝবো। অ্যারিস্টটল কৃত তা ক্ষুদ্র হলেও যথেষ্ট সারগর্ভ।

'নী' ধাতুর সঙ্গে 'অক' প্রত্যয় যোগে উদ্ভূত 'নায়ক' শব্দের অর্থ হল, নাটকাদির প্রধান পুরুষ, যিনি ঘটনা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করেন। অ্যারিস্টটলের মতে ট্রাজেডির নায়ক চরিত্রের চারটি ধর্ম থাকবে—(ক) ভাল মানুষী বা সততা, (খ) যথাযোগ্যতা বা শোভনতা (গ) জীবনানগাল বা সাদৃশ্য এবং (ঘ) নীতিনিষ্ঠতা বা সঙ্গতি।

অ্যারিস্টটল তার কল্পিত ট্রাজেডি থেকে দুবৃর্ত্ত এবং সাধু পুরুষ—উভয় ধরনের চরিত্রকেই বাদ দিয়েছেন। তিনি চরিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই ভালোমানুষী বা

সততার ধর্মটি উল্লেখ করেছেন। যে সব বক্তব্য বা ক্রিয়াকলাপ নৈতিক উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করে সেগুলি হবে চরিত্রের অভিব্যক্তি। সেহেতু উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, তাহলে চরিত্রও ভালো হবে। অর্থাৎ একটি ভালো সিদ্ধান্ত চরিত্রকে ভালো করে তোলে। প্রতিটি শ্রেণির মানুষের মধ্যে ভালো চরিত্র পাওয়া সম্ভব এমন-কি একজন নারী এবং একজন ক্রীতদাসও ভালো হতে পারে। যদিও এ দু'জনের একজন হয়তো দুর্বল এবং অপরজন সাধারণ কথায় অপকৃষ্ট। প্রসঙ্গত বলা প্ররোজনা যে, এই সততা শব্দটিকে কেন্দ্র করে সমালোচকদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। কারুর মতে 'সৎ' বলতে এখানে 'গৌরব সমৃদ্ধ', কেউ বলেন 'প্রখ্যাত', আবার কারুর মতে ধার্মিক'। অ্যারিস্টটল অবশ্য কাব্যতত্ত্বের আলোচনায় ধর্মনীতিগত বিষয়টিকে টেনে আনেননি। তিনি 'সততা' বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন, তা হল—নায়ক চরিত্রটি হবে অসাধারণ গুণ সম্পন্ন, তার মধ্যে মহৎ এবং বৃহৎ—এই দুটি গুণই থাকবে, আমৃত্য তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকবেন, আর এর ফলে তার পতন দর্শকের মনে ভয় ও করুণার সার ঘটাবে।

নায়ক চরিত্রে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য যথাযোগ্যতা বা শোভনতা। এর অর্থ চরিত্রটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর প্রতিভূ হবে, অর্থাৎ সামাজিক বা রাষ্ট্রিক পদমর্যাদা অনুযায়ী চরিত্রটির মধ্যে যথাযথ গুণ। থাকবে। সম্রাট হবেন সম্রাটের মতো, সেনাধ্যক্ষ হবেন সৈনাধ্যক্ষর মতো এবং দাস হবে দাসের মতো। এই বৈশিষ্ট্যকে ঔচিত্যও বলা যায়। এই ধরনের ঔচিত্য নারীর পক্ষে রক্ষা কর নয়। তাই নায়ক চরিত্রের পদ থেকে নারীকে বর্জন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন, একটি জাতির প্রতিভূ হয়েও নায়ক আপন ব্যক্তিত্ত্বায় ভাস্বর হবেন । তিনি একই সঙ্গে নির্বিশেষ ও বিশেষের যুগল মূর্তি লাভ করবেন।

নায়ক চরিত্রের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য জীবনানুগত বা সাদৃশ্য। এর অর্থ বাস্তবের মতো বা Reality ।এটি কিন্তু যথাযোগ্যতা থেকে স্বতন্ত্র। মানুষ যতই শৌর্য-বীর্যে অসাধারণ হার মনে গহন গভীরে একটা দুর্বলতা বা বেদনা থাকবেই। এখানেই একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে নায়কের সাদৃশ্য। এই সাদৃশ্যের কারণেই সাধারণ দর্শক নায়কের জীবনের করুণ পরিণামে ব্যথিত হবে।

নায়ক চরিত্রের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য নীতিনিষ্ঠতা বা সঙ্গতি। এ কথার অর্থ হল চরিত্রের কর্মধারার মধ্যে একটা সঙ্গতি থাকবে। অনুকরণের বিষয় উপস্থাপনার ব্যাপারে কোন চরিত্র যদি অসঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলেও সেই চরিত্রের অসঙ্গতিকে সঙ্গতি পূর্ণ হতে হবে। আদান্ত সামঞ্জস্যই নায়ক চরিত্রের মূল কথা। প্রয়োজনাতিরিক্ত অপকৃষ্টতায় গড়া চরিত্রের একটি দৃষ্টান্ত হল 'ওরেস্টেস'-এর মেনেলাউস। অসম্মতি বা নিষ্টাহীনতার দৃষ্টান্ত হল-'আউলিস'-র ইফিজেনাইয়া। চরিত্র সৃজনে যেমন, ঘটনা বিন্যাসেও তেমনি কবিকে সর্বদা সন্ধান করতে হয় কোনটি অনিবার্য বা সম্ভাব্য। কিসের পরে কি ঘটতে পারে, সে সম্পর্কে কবি যদি সচেতন না হন, তাহলে সার্থক ট্রাজেডিও সৃষ্টি হবে না, চরিত্রও বিফল হবে।

ট্রাজেডিতে সাধারণের চেয়ে ভালো লোকের অনুকরণ করা হয়। তাই কবিকে একজন ভালো চিত্রশিল্পীর অনুসারী হতে হবে। মানুষের প্রতিকৃতি আঁকার সময় একজন শিল্পী তার। প্রতিকৃতিকে মানুষের মতো করেই আঁকেন, আবার তাকে প্রিয়দর্শনও করে তোলেন; তেমনি কবি একজন বদরাগী বা কর্মবিমুখ মানুষের দোষ-ত্রুটি যেমন তুলে ধরবেন, তেমনি তাকে। মোহনীয় করে তুলবেন। হোমার যেমন আকিলেসকে রূপায়িত করেছিল একজন উন্নত মানুষ ও রূঢ়তার এক প্রতিমূর্তি হিসাবে।

অ্যারিস্টটলের নায়ক সম্পর্কিত আলোচনার সারসার এবার আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে পারি

১। ট্রাজেডির নায়ক হবেন এমন ব্যক্তি, যিনি অবিশ্বাস্য রূপে ভালোও হবেন না, আবার মন্দও হবেন না। তিনি হবেন দোষে-গুণে ভরা রক্ত-মাংসের মানুষ।

২। নায়কের পতন হবে নির্দিষ্ট কোনো দুর্নীতির জন্য নয় তারই অর্ন্তনিহিত একটা। মারাত্মক ভ্রমের জন্য। গ্রীক ভাষায় এই ভ্রমকে বলা 'Hamartia'। পোয়েটিক্স গ্রন্থে অবশ্য এ সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা নেই। তবে Ethics গ্রন্থে অ্যারিস্টটল-এর মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

৩। অ্যারিস্টটল তিন ধরনের অন্যায়ের কথা বলেছেন, যেমন—অনিচ্ছা সহকারে বা অজ্ঞাতসারে কাউকে আঘাত করা, ইচ্ছা পূর্বক জোর করে কাউকে আঘাত করা। এবং যতটা আঘাত করার ইচ্ছা ছিল অনিচ্ছা পূর্বক সেই আঘাত বেশি হয়ে যাওয়া। এই সমস্ত মারাত্মক ভ্রমগুলির জন্য ট্রাজেডি সংগঠিত হবে।

৪। নায়ক চরিত্র ছোট-খাটো ভুল-ত্রুটি করবে। তবে চরম মুহূর্তে কোন ত্রুটি করলে। তার আর পরিশ্রম থাকবে না। চরম মুহূর্তের জুটিই নায়ক চরিত্রকে ট্র্যাজিক পরিনামী করে তুলবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, অ্যারিস্টটল কৃত ট্রাজেডি সম্পর্কিত আলোচনা আজও যথেষ্ট মূল্যবান। যদি শেক্সপীয়র এবং আরো অনেক বিশ্ববন্দিত সাহিত্যিক ট্রাজেডির নতুন নতুন ধারণা তৈরি করেছেন, তবুও আরিস্টটল বক্তব্য গুরুত্বহীন হয়ে যায়নি।

৬.৭ অনুশীলনী

১। পোয়েটিক্স গ্রন্থের সামগ্রিক পরিচয় দিয়ে আলোচিত মূল বিষয়গুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

২। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স গ্রন্থের দ্বারা ইউরোপীয় সাহিত্য সমালোচনা সূত্রপাত ঘটে, এ ক্ষেত্রে নাটক বিচার সূত্র গুলি অদ্বিতীয় হয়ে উঠেছিল, আলোচনা করো।

৩।ষড়ঙ্গ শিল্পের প্রতিটি অঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো।

৪।প্লট হল ট্রাজেডির আত্মা, চরিত্র গৌণ- অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স গ্রন্থ অবলম্বনে মন্তব্যটি সমর্থন করো।

৫। ট্রাজেডির নায়েক সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখ।

৬.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১।অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স – ভবানীগোপাল সান্যাল

২।অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব –সাধন কুমার ভট্টাচার্য

৩।কাব্যতত্ত্ব অ্যারিস্টটল – শিশিরকুমার দাশ

একক ৭ ‘পোয়েটিক্স’ গ্রন্থের অন্যান্য তত্ত্ব

বিন্যাসক্রম

৭.১ মহাকাব্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

৭.২ মহাকাব্য ও ট্রাজেডি সম্পর্ক।

৭.৩ ট্রাজেডির ত্রিবিধ ঐক্য

৭.৪ মাইমেসিস' বা 'অনুকরণ’ তত্ত্ব

৭.৫ 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে ব্যবহৃত ‘ক্যাথারসিস’

৭.৬ কমেডি

৭.৭ অনুশীলনী

৭.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৭.১ মহাকাব্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

আরিস্টটল ‘পোয়েটিক্স’ গ্রন্থে মূলত ট্রাজেডি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ক্রমে তার আলোচনাতে কমেডি এবং মহাকাব্যের বিষয় স্থান লাভ করেছে। তৎকালীন গ্রীসে ট্রাজেডি ছাড়াও মহাকাব্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছিল। তাই স্বাভাবিক ভাবেই অ্যারিস্টটল ট্রাজেডিও মহাকাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। ‘পোয়েটিক্স’ গ্রন্থে ৪, ২৩, ২৪ এব ২৬ পরিচ্ছেদে ট্রাজেডি ও মহাকাব্যের তুলনামূলক আলোচনাগুলি

লক্ষ্য করা যায়, আলেনাচনার মধ্যে দিয়েই তিনি উভয় শিল্প রূপের স্বতন্ত্র চিহ্নিত করেছেন।

বিভিন্ন পরিচ্ছেদে অ্যারিস্টটল মহাকাব্য সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তার উপর ভিত্তি করে আমরা প্রথমেই মহাকাব্যের একটা সংক্ত নির্দেশ করতে পারি আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত, উপশাখা কাহিনিযুক্ত, নাট্য লক্ষণাক্রান্ত, একই ছন্দে বিবৃত, মহি**মান্বিত লোকজীবনের** অনুকরণে লিখিত একমুখীন কাহিনি হল মহাকাব্য । অ্যারিস্টটল বলেছেন, "মহাকাব্যে যা যা আছে সে সব ট্রাজেডিতেও বিদ্যমান। তবে ট্রাজেডিতে যা যা আছে তাদের কিছু অবশ্য মহাকব্যে নেই।" মহাকাব্যের উপাদান সংগ্রহীত হয় একটি দেশের বিচিত্র জীবনধারা, রীতিনীতি সংস্কার, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি থেকে অর্থাৎ মহাকাব্যে একটি জাতীয় জীবনের আত্মসাক্ষাৎ ঘটে। মহাকাব্যে রচয়িতার মনোভাব অপেক্ষা জাতীয় জীবনের প্রাণস্পন্দন বড় হয়ে ওঠে। বিশালতা মহাকাব্যের সম্পদ। আধুনিক যুগে আর মহাকাব্য রচিত হয় না। তার অন্যতম কারণ বোধ হয় এই যে, আমরা আজ জাতীয় স্বার্থের তুলনায় ব্যক্তিস্বার্থে অনেকটাই নিয়োজিত। সমগ্র বিশ্বে চারটি মহাকাব্য রয়েছে—ইলিয়াড, ওডিসি, রামায়ণ, মহাভারত। অ্যারিস্টটলের আলোচনায় অবশ্য

রামায়ণ মহাভারত আসেনি ,আসাটাও সম্ভব ছিল না। অবশ্য হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসিকে কেন্দ্র করে তিনি মহাকাব্যের যে বিশ্লেষণ করেছেন, তার সত্যতা এই আড়াই হাজার বছর পরেও অম্লান।

মহাকাব্য ও ট্রাজেডির কিছু কিছু সাদৃশ্য তিনি নির্দেশ করেছেন। বিভিন্ন পরিচ্ছেদ থেকে সংগ্রহ করে সেই সাদৃশ্যগুলি নিম্নে তালিকাভুক্ত করা হল

(ক) মহাকাব্যের সঙ্গে ট্রাজেডির সাদৃশ্যের মূল কারণ উভয় ক্ষেত্রেই মহিমা মণ্ডিত লোকেদের অনুকরণ করা হয়। (খ) উভয় সাহিত্যধারার বিষয়বস্ত গভীর।

(গ) এই দুই শিল্প মাধ্যমের প্রকাশ ছন্দময়।

(ঘ) উভয় শিল্প মাধ্যমের কাহিনি আদি-মধ্য-অন্ত বিশিষ্ট এবং একমখীন।

(ঙ) উভয় ক্ষেত্রেই রচয়িতা নৈব্যক্তিক থাকবেন।

সাদৃশ্যের পাশাপাশি এই দুই শিল্প মাধ্যমের বৈসাদৃশ্যগুলিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ২৪ পরিচ্ছেদে মহাকাব্য এবং ট্রাজেডির পার্থক্যগুলি সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন অ্যারিস্টটল।

১। মহাকাব্য বর্ণনাত্মক, কিন্তু ট্রাজেডি দৃশ্যকাব্য। অবশ্য বর্ণনাত্বক হলেও মহাকাব্যের কাহিনি ট্রাজেডির মতই নাটকীয় শৈলীতে প্রকাশ করা উচিত।

২। ট্রাজেডির মধ্যে গান এবং দৃশ্য এই দুটি বিষয় আবশ্যিক ভাবে উপস্থিত থাকে। কিন্তু মহাকাব্যের মধ্যে গান এবং দৃশ্যের উপস্থাপনা সম্ভব নয়।

৩। কাহিনি ঘটনের দৈর্ঘ্যে মহাকাব্য এবং টাজেডিকে পৃথক করা যায়। বর্ণনাত্মক বলেই মহাকাব্যের কাহিনি হয় বিস্তৃত। আর ট্রাজেডি যথা সম্ভব একদিনে মধ্যেই তার ক্রিয়াকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করে, বা একদিনের কার্যসীমাকে বেশি অতিক্রম করে না।

৪। মহাকাব্যের মধ্যে একই সময়ে বহু ঘটনা উপস্থাপিত হতে পারে, যেহেতু এটি বর্ণনামূলক কাব্য। অপরদিকে নাটক দৃশ্যকাব্য বলেই একই সঙ্গে একাধিক ঘটনা উপস্থাপিত করা যায় না। অ্যারিস্টটল বলেছেন—এক একটি মহাকাব্যকে কেন্দ্র করে একাধিক ট্রাজেডি গড়ে উঠতে পারে।

৫।মহাকাব্য একটি মাত্র ছন্দে রচিত হওয়া উচিত। "যদি কেউ বর্ণনামূলক অনুকরণের কাব্য রচনায় অন্য কোন ছন্দের প্রয়োগ করে, বা নানা ছন্দের মিলন ঘটায়, তবে সেটা বেমানান ঠেকতে পারে।" কিন্তু ট্রাজেডি বিভিন্ন ছন্দে রচিত হয়।

৬। মহাকাব্যে বিবৃতিমূলক ঘটনাগুলিকে পাঠক বা শ্রোতা মানস অবলকোণের দ্বারা প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু ট্রাজেডি শুধু পাঠ করে তৃপ্ত হওয়া যায় না। এটি যেহেতু দৃশ্যকাব্য, তাই এর অভিনীত দিকটাই দর্শকের মনে রসাবেদন সম্ভার করে।

৭। মহাকাব্যের মধ্যে গুণগত এবং আকারগত দুটি বৈশিষ্ট্যই আছে। কিন্তু ট্রাজেডির বৈশিষ্ট্য কেবল গুণগত। মহাকাব্য এবং ট্রাজেডির তুলনামূলক বিচারে অ্যারিস্টটল গুণগত দিকটির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। অনেকেই মহাকাব্যকে উদ্ধৃষ্টতর

শিল্প মাধ্যম বলতে চান। তাদের যুক্তি হল—মহাকাব্যের আবেদন হচ্ছে রুচিশীল প্রেক্ষকের কাছে। এই প্রেক্ষকেরা অঙ্গভঙ্গির প্রয়োজন অনুভব করেন না। আর ট্রাজেডির আবেদন দ্বিতীয় শ্রেণির প্রেক্ষকদের কাছে। যদি এটাই বাস্তব হয়ে থাকে, তবে ট্রাজেডি নিম্ন রুচির এবং স্পষ্টতই নিকৃষ্টতর শিল্প। অ্যারিস্টটল অবশ্য এই মত স্বীকার করেননি। তিনি গুণগত দিক থেকে বিচার করে ট্রাজেড়িকে উন্নততর শিল্প মাধ্যম বলেছেন। তার মতে মহাকাব্যের তুলনায় ট্রাজেডির উপাদান অনেক বেশি। পাঠে এবং মঞ্চাভিনয়ে ট্রাজেডির একটা সাবলীলতা আছে। তাছাড়া স্বল্প কালসীমার মধ্যে এর রস নিস্পতি ঘটে বলেই পাঠক ও শ্রোতার কাছে মহাকাব্যের তুলনায় ট্রাজেডির আবেদন অনেক বেশি।

অবশ্য তুলনামূলক বিচারে অ্যারিস্টটল ট্রাজেডিকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিলেও এ ব্যাপারে সমালোচকগণ একমত নাও হতে পারেন। যেক্ষেত্রে অ্যারিস্টটলের সিদ্ধান্তটি একদেশদর্শীতা হওয়ার দোষে দুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৭.২ মহাকাব্য ও ট্রাজেডি সম্পর্ক।

অ্যারিস্টটল তার পোয়েটিক্স গ্রন্থে ট্রাজেডি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মহাকাব্যের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন। মহাকাব্য সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের ধারণাটি এই রূপ : মহাকাব্যের কাহিনি হবে বিশাল; স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়ে তার বিস্তার। কোনো দেবতা বা সবংশজাত ক্ষত্রিয় এবং গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি হবে মহাকাব্যের নায়ক। নায়কের জীবনের উত্থান-পতনের সঙ্গে জাতীয় জীবনের ভাগ্য জড়িত হয়ে পড়বে। মহাকাব্যের কাহিনির মধ্যে। বাহুল্য থাকলেও তার গঠন হবে সংগত এবং দৃঢ়। মহাকাব্য রচিত হবে ছন্দে। ছন্দ হবে গম্ভির দৃঢ় ধ্বনি যুক্ত।মহাকাব্যের কাহিনিতে ইতিহাস থাকলেও, ইতিহাসের সাথে তাকে সমার্থক কী খায় না। কারণ মহাকবি ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে মহাকাব্য রচনা করতে পেনি, আবার কাল্পনিক কাহিনিকেও আশ্রয় করতে পারেন। তার কাহিনি কাল্পনিক হলেও সম্ভাবতার দিকে মহাকবিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখতে হয়। মহাকাব্যের কবি অনুকরণের ওপর নির্ভর করে কাব্যের মূল কাঠামো

তৈরি করেন। তবে ট্রাজেডিতে যেভাবে জীবনকে অনুকরণ করা হয় মহাকাব্যে তা হয় না। ট্রাজেডির কাহিনি যতটা কমপ্যাক্ট এবং একমখীন হয়, মহাকাব্যের কাহিনি তা হয় না। ট্রাজেডিতে উপকাহিনি প্রাধান্য থাকে না, কিন্তু মহাকাব্য যথেষ্ট উপকাহিনি পাওয়া যায়। ইলিয়াড, ওডিসি প্রমাণই বহন করে।

মহাকাব্য বর্ণনাভিত্তিক। তাই মহাকাব্যের কবি একাধিক উপাখ্যানের মাধ্যমে মহাককে ঘটনাকে এমনভাবে সাজান, যাতে পুরো বিষয়টা একটা চমৎকার অবয়ব ধারণ করতে জানে কিন্তু টাজেডি বর্ণানত্মক নয়। কারণ তার ব্যবহার মঞ্চে। তাই ট্রাজেডিতে ক্রিয়ামূলক ভাবের অবতারণা ঘটানো হয়। মহাকাব্য বর্ণনাভিত্তিক বলেই এখানে স্বগোক্তির স্থান রয়েছে। এ কখনো কখনো কবি ব্যাখ্যাকারির ভূমিকাও গ্রহণ করেন। কিন্তু ট্রাজেডি রচয়িতা কোনো অবস্থাতেই ব্যাখ্যাকারি হন না। তাকে অনুকারক বলা যেতে পারে।

ট্রাজেডির একটি অপরিহার্য ধর্ম সংলাপ। মহাকাব্যের মধ্যে সংলাপ থাকতে পারে, থাকলেও ক্ষতি নেই। যেখানে মহাকবি সংলাপ ব্যবহার করেন, সেখানে আসলে তিনি indirect ভাবে কাহিনিটিকে প্রকাশ করেন।

মহাকাব্য আকারে বড়, ভাবের দিক থেকে গাঢ়, তাছাড়া এর রসের মধ্যে বৈচিত্র লক্ষ্যনীয়। ট্রাজেডি আকারে ছোটো এবং এর ভাব সূক্ষ্ম এবং অঙ্গীরস একটি।

ট্রাজেডি ষড়ঙ্গ শিল্প। এর ছটি অঙ্গ হল কাহিনি, চরিত্র, অভিপ্রায়, ভাষা, পাত্র ও দৃশ্য। মহাকাব্য চতুরঙ্গ শিল্প। এর অঙ্কগুলি হল—কাহিনি, চরিত্র, অভিপ্রায় ও ভাষা। ট্রাজেডিতে ছন্দের বৈচিত্র্য থাকে। মহাকাব্যেও থাকে। তবে ট্রাজেডির ছন্দ মহাকাব্যের ছন্দের চাইতে অনেক বেশি গুরু-গম্ভীর এবং ওজস্বি হয়।

তবে একথা ঠিক যে, ট্রাজেডি এবং মহাকাব্য উভয় শাখাতেই উন্নত ধরনের দেশ ও জাতির কথা বলা হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি, এমনকি আধুনিক কালের সাহিত্যিক মহাকাব্যগুলির দিকে তাকালেও একরকম সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। অ্যারিস্টটল অবশ্য মনে করেন, মহাকাব্যের তুলনায় ট্রাজেডি অনেক বেশি

জনপ্রিয় শিল্প মাধ্যম। এর মূল কারণ বোধ হয় এই যে, মহাকাব্য কেবলমাত্র পাঠ্য, আর ট্রাজেডি একই সঙ্গে পাঠ্য, শ্রব্য, দৃশ্য।

৭.৩ ট্রাজেডির ত্রিবিধ ঐক্য

অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের ভাষ্য রচনায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। বিভ্রান্তির তালিকায় প্রথমেই স্থান লাভ করে ত্রিবিধ ঐক্য। পঞ্চম পরিচ্ছেদে মহাকাব্য এবং ট্রাজেডির দীর্ঘতার পরিমাপ প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল বলেছেন, "ট্রাজেডি যথাসঞ্জী একদিনের মধ্যে তার ক্রিয়াকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করে, ট্রাজেডির ঘটনা সমূহের কালসীমা—সূর্যের একটি আবর্তন, A single title of the Sun. যার অর্থ করা হয়েছিল। চব্বিশ ঘণ্টা, রেনেসাঁসের পর্বে বারো ঘণ্টা"। অ্যারিস্টটলের এই অভিব্যক্তি থেকে ইতালিয়ান সমালোচক কাস্তেল ভেত্রো ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিবিধ ঐক্যের তত্ত্বটি প্রণয়ন করেন।

ইতালিয়ান পণ্ডিতের অভিমত যে গ্রহণযোগ্য নয়, তা আমরা ডঃ শিশিরকুমার দাস অনুসরণে আলোচনা করতে পারি। তিনি বলেছেন, অ্যারিস্টটলের বক্তব্য বলে প্রচারিত এমন অনেক মতবাদ আছে, যা অ্যারিস্টটলের নয়। নাটকের বিবিধ ঐক্য বলে যা প্রচারিত হয়ে সে সম্পর্কে কিছুই বলেননি। ৬, ৭, ৮ পরিচ্ছেদ তিনটিতে অ্যারিসটটল একাধিক বার বলেছেন যে, ট্রাজেডির ক্রিয়ার মধ্যে একটা গভীর ঐক্য থাকবে। একটি আসৰে কাহিনির নাতি থেকে, কাহিনির গঠন থেকে নয়। অ্যারিস্টটল ক্রিয়াগত ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন ঠিকই; কিন্তু তিনি কখনই সময়-স্থান-ঘটনা এক্যের গুণফলের কথা বলেননি।

১৭ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, কাহিনি নির্মাণের ব্যাপারে কবি প্রচলিত কাহিনি গ্রহণ করুন। অথবা নিজস্ব নতুন কাহিনিই রচনা করুন, প্রথমে তাকে কাহিনির একটা মোটামুটি রেখাচিত্র অঙ্কন করে নিতে হবে। তারপর ঘটনা দিয়ে ভরিয়ে কাহিনিকে বিস্তৃত ভাবে সম্প্রসারিত করা উচিত। একটি কাহিনিকে বিভিন্ন ভাবে ভরিয়ে তোলা,

এর মূলে কিন্তু ঘটনাগত ঐক্য স্থান পায় না, স্থান পায় ক্রিয়াগত ঐক্য। একটা বিশ্বজনীন বোধ থেকেই এই ক্রিয়াগত ঐক্যটি আসে।

অনেকে মনে করেন একজন নায়কের কথা বলা হলেই কাহিনির মধ্যে ঐক্য আসবে, কিন্তু বাস্তবে তা কখনই সম্ভব নয়। একজন নায়ক ছাড়াও একাধিক নায়কের কর্মকাণ্ডের মধ্যে একা আসতে পারে, যদি তাদের ক্রিয়াগত লক্ষ্যটি মোটামুটি একই ধরনের হয়। এই ক্রিয়াগত ঐক্যের সঙ্গে আবার জড়িত কালগত ঐক্য। যদিও অ্যারিস্টটল ট্রাজেডির একটি কালসীমা, নির্দেশ করেছেন, কিন্তু তিনি কখনই ১২ ঘণ্টা বা ২৪ ঘন্টার কথা বলেননি। তিনি মহাকাব্য। এবং ট্রাজেডির দৈর্ঘ্যের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে এরূপ একটি সময় সীমার কথা উল্লেখ করেছিলেন। একথা ঠিক মহাকাব্য অধিক দিনের ঘটনা থাকে, কিন্তু ট্রাজেডিতে শুধু একদিনের। ঘটনা থাকবে তা নয়, একাধিক দিনের ঘটনাও সেখানে সন্নিবেশিত হতে পারে। স্থানগত ঐক্য সম্পর্কে আরিস্টটল কিছুই বলেননি। অ্যারিস্টটলের সময়কালে গ্রীকম কোন যবনিকা থাকতো না। তখন কোরাসের দ্বারা নাটকীয় ঘটনার বিভিন্ন স্থানগুলি নির্দেশিত হত। অনেক সময় দৃশ্যটি একই সময়ে ঘটত, অনেক সময় আবার তা পাল্টে যেত। তবে বিভিন্ন স্থানে। ঘটলেও ক্রিয়াগত ঐক্যের দিকটি কখনই লঙ্ঘিত হত না।

অ্যারিস্টটলের ত্রিবিধ ঐক্য সম্পর্কে আধুনিক পণ্ডিতবর্গ অস্বীকার করেছেন। তবে একথা সত্য যে, ভাবগত ঐক্যের দিকটি বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখা দরকার। দেশগত এবং কালগত। ঐক্য না থাকলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু ভাবগত ঐক্য না থাকলে শুধু ট্রাজেডিই নয়, যেকোন শিল্প মাধ্যমেরই সাফল্য লাভ অধরা থেকে যাবে।

৭.৪ মাইমেসিস' বা 'অনুকরণ' তত্ত্ব

সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প প্রভৃতিকে অ্যারিস্টটল তার Poetics গ্রন্থে অনুকরণের ফল বলে গণ্য করেছেন। গ্রীক ভাষায় তার ব্যবহৃত শব্দটি হল 'মাইমেসিস।' এই শব্দের ব্যবহার তিনিই প্রথম কলেছেন তা নয়, তার পুর্বে প্লেটো "দি রিপাবলিক" গ্রন্থে বহুবার শব্দটি

ব্যবহার করেছেন এবং এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্লেটোর পূর্বে সক্রেটিসও এই ব্যবহার করেছেন। মাইমেসিসের প্রকৃত তাৎপর্য আলোচনার পূর্বে আমরা শব্দটির প্রতিশব্দ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব।

প্লেটো তার রিপাবলিক গ্রন্থে তৃতীয় ও দশম অধ্যায় মাইমেসিস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি শব্দটিকে দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে মাইমেসিস শব্দটিকে যে অর্থে ব্যবহার করেছেন তার ইংরাজি প্রতিশব্দ হতে পারে impersonation, অর্থাৎ লেখক যখন নিজে বক্তার ভূমিকায় না থেকে অন্য চরিত্রকে dialouge বা কথোপকথনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেন, তখন তাকেই বলা হয় Impersonation। দশম অধ্যায়ে মাইমেসিস শব্দটিকে অনুকরণ রূপায়ণ অর্থে ব্যবহার করেছেন। সুতরাং প্লেটো মাইমেসিসের একটি অর্থ করে ছিলেন Impersonation এবং অপর অর্থ করেছিলেন Imitation। অ্যারিস্টাটল এই Imitation অর্থে শব্দটিকে গ্রহণ করেছিলেন। তবে তার কাছে Imitation কোনো সংকীর্ণ শব্দ মাত্র নয়। এর অর্থ ব্যাপক এবং বহু বিস্তৃত। বুচার, বাই ওয়াটার প্রমুখ বিখ্যাত সমালোচকগণ Poetics এর আলোচনায় মাইমেসিসের প্রতিশব্দ রূপে। Imitation শব্দটাকে গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাতেও আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের আলোচনা মেনে অনুকরণ শব্দটিকে এই শব্দের প্রতিশব্দ রূপে গ্রহণ করব।

প্লেটো অনুকরণের বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। 'দি রিপাবলিক' গ্রন্থে তিনি এ প্রসঙ্গে যে আলোচনাটি করেছেন তার সংক্ষিপ্তসার এইরূপ প্লটোর বিচারে জগতের স্রষ্টা ঈশ্বর, তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সবকিছু মানে এখানে আকাশ, পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র, জল, স্থল, পাহাড়, নদী প্রভৃতি। এক কথায় বলা যেতে পারে সমস্ত রকম প্রাণের স্রষ্টা ঈশ্বর। আর এসবের বাইরে মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করছে তা সবই সেই সৃষ্টিরই অনুকরণ। বাড়ি, ঘর, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি। সবকিছুই অনুকরণ জাত। প্লেটোর বিচারে এরূপ অনুকরণ মিথ্যা মাত্র। তিনি এই ধরনের। অনুকরণকে সত্য থেকে তিন ধাপ দূরে বলে অভিহিত করেছেন। তিন ধাপ দুরে এই কারণেই যে, ইহজগতে যা আছে, তা হল এক অপার্থিব Ideal-এর ত্রুটিপূর্ণ অনুলিপি। কবি বা শিল্পী যখন সেই

ইহজগতের অনুকরণ করেন, তখন তিনি মূল সত্যের বিকৃত নকলের নকল করে। তিন ধাপ দূরে সরে যান। সুতরাং এ জাতীয় অনুকরণ প্রধান শিল্প-সাহিত্য থেকে শেখার কিছুই নেই বলে প্লেটো মনে করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তার গ্রন্থে শেষপর্যন্ত একথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন, অনুকরণ করতেই হয়। তবে সৎ ও সুন্দরকে অনুকরণ করতে হবে। অ্যারিস্টটল প্লেটোর শিষ্য হলেও তিনি তার আদর্শে মাইমেসিস বা আনকরণ তত্ত প্রতিষ্ঠা করেননি। প্লেটোর সাথে অ্যারিস্টটলের মূল পার্থক্যটি হল—প্লেটো যে Ideal-এর অপূর্ণ। অনুকরণ রূপে জগতকে দেখে, শিল্প-সাহিত্যকে

সেই ত্রুটিপূর্ণ অনুকরণের অনুকরণপে ছোটো চোখে দেখেছিলেন; অ্যারিস্টটল সেরকম কোনো Ideal-এর অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেননি। আর তাই তার কাছে, কাব্যের সত্য চিরন্তন সত্য রূপে প্রতিভাত হয়েছে। অ্যারিস্টটল মনে। করতেন অনুকরণের বাসনা থেকে শিল্প-সাহিত্যের জন্ম, এবং অনুকৃত বস্তর বপদর্শন করে। মানুষ আনন্দ লাভ করে। সুতরাং মানুষকে আনন্দ দানই শিল্প সাহিত্যের উদ্দেশ্য- একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-সঙ্গীতকার প্রমথ সকলেই বস্তু বিশ্বের অনুকরণে তাদের ব্রচনার অনুকরণ করেন। বস্তু বিশ্ব একটি নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয়। এখানে প্রতি মুহূর্তে লক্ষ-কোটি ঘটনা ঘটে চলেছে। আর এ সকল ঘটনার অনুকরণে। ট্রাজেডি, কমেডি মহাকাব্য, সঙ্গীত প্রভৃতি রচিত হচ্ছে। সাহিত্যে কোন একটি বৃহৎ যা, ক্ষুদ্র ঘটনা থাকেই এবং সেই ঘটনার মধ্যে প্রেম, ভালোবাসা, ত্যাগ, বীরত্ব, বনা প্রভু কোন-না-কোন একটি বিষয় বর্ণিত হয়। যখন সাহিত্যের জন্ম হয়নি, তখনও এ সকল বিষয়গুলি বস্তুবিশ্বে ছিল। অর্থাৎ সাহিত্যের ঘটনার বহু পূবেই মানুষের জীবনের ঘটনা তৈরি হয়েছে। তাই অ্যারিস্টটল যখন বলেন সাহিত্য বস্তুবিশ্বের অনুকরণ তখন তার বক্তব্যের সত্যতাকে অস্বীকার উপায় থাকে না।অ্যারিস্টটলের যুগে অর্থাৎ প্রাচীন কালে প্রায় সকল প্রকার শিল্পই অনেক সময় বস্তু আমার অবিকল আদল অনুসারে প্রস্তুত হতো। প্রাচীন গ্রীক ভাবনায় সুন্দর সুন্দর দেবদেবীর মূর্তি তৈরি হয়েছে। এই সকল দেবদেবীর মুখের আদল আসলে ভাস্করদের দেখা সুন্দর নর-নারীর মুখের আদলে তৈরি। আধুনিক কালে অবশ্য শিল্পী ও সব সময় প্রত্যক্ষ করেন তা নয়, তারা তাদের

জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বৈজ্ঞানিক বিচার-বুদ্ধি ও কল্পনার সাহায্যে অনেক সময় এমন কিছু সৃষ্টি করে ফেলেন, যার অস্তিত্ব বাস্তব জগতে প্রত্যক্ষ গ্রাহা নয়। কিন্তু তাহলেও সেই সৃষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন অংশগুলির বাস্তব জগতের কোথাও না কোথাও মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। উদাহরণ হিসেবে পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা উল্লেখ করা যায়। বাস্তব জগতে এরূপ কোনো প্রাণী নেই। কিন্তু শিল্পীর কল্পনার জগতে বাস্তব গ্রাহ্য ঘোড়া ও পাখীর মিশ্রণে এই মূর্তির ভাবনাটি তৈরি হয়ে গেছে। সুতরাং অনুকরণ হলেও কোনো অনুকরণই বাস্তব জগতের ষোলোআনা অনুরূপ হতে পারে না।সেখানে কল্পনার মিশ্রণ ঘটে। প্লেটোর মনে যেহেতু একটি Ideal-এর ধারণা ছিল, সেহেতু তিনি এরূপ অনুকরণকে মিথ্যাচারীতার দোষে দুষ্ট করেছেন। কিন্তু। অ্যারিস্টটল এই অনুকরণের মধ্যে চিরন্তন সত্যের আভাস খুঁজে পেয়েছেন। অ্যারিস্টটল অনুকরণের তিনটি বিধি বা ধারার কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—অনুকরণের বিষয়, অনুকরণের মাধ্যম এবং অনুকরণের রীতি। |অনুকরণের বিষয় বলতে যা অনুকৃত হয় সেই ঘটনা বা বস্তুকে বোঝায়। বিশ্ব সংসারে সব ঘটনা বা ব্যক্তি একরকম হতে পারে না। প্রতি দুটি ঘটনা বা বিষয় বা ব্যক্তির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রেছে। সুখী মানুষের জীবনের ঘটনা এক রকম, দুঃখী মানুষের জীবনের ঘটনা আর এক রকম। আবার দুজন দুঃখী মানুষের শোক-তাপের অনুভূতি এবং প্রকাশও ভিন্নধর্মী। এক এক রকম না অবলম্বনে এক-এক রীতির শিল্প তথা সাহিত্য রচিত হতে পারে। তাই দুঃখপূর্ণ জীবন বনে গড়ে ওঠে ট্রাজেডি আর আনন্দময় জীবন অবলম্বনে গড়ে ওঠে কমেডি, একের বিষয় ক্ষেত্রে কখনোই *প্রয়োগ* করা যায় না। আরো কিছুটা নিবিড় বিশ্লেষণ করলে আমরা বলতে বাধ্য যে, ট্রাজেডি বা মহাকাব্য রচনা করতে গেলে যে পরিমাণ দুঃখের প্রয়োজন একটি ক্ষুদ্র শোকে কবিতা রচনা করতে গেলে সে পরিমাণ দুখের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ শুধু উপা*দান নয়* অনুকরণের ক্ষেত্রে তার পরিমাণেরও তারতম্য ঘটে।

অ্যারিস্টটল অনুকরণের মাধ্যমের অপর গুরুত্ব দিয়েছেন।একই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প প্রকাশ পায়। কাব্য সাহিত্যের মাধ্যম হল ভাষা। আবার এই ভাষা কবি, নাট্যকার বা ঔপন্যাসিক ভাষার মাধ্যমে অনুকরণ করেন। তাদের প্রকাশ রীতিও ভিন্ন হয়। অনুকরণের মাধ্যমের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তার মতে যত শিল্প,

তত একই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প প্রকাশ পায়। কাব্য-সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা। *আবার* এই ভাষা ব্যবহারের পার্থক্যে প্রকাশের পার্থক্য ঘটতে পারে। কিন্তু কাব্যের ভাষার সঙ্গে নাট্যকারের ভাষারীতি এক নয়।

অ্যারিস্টটলের মতে এই পার্থক্যের কারন অনুকরণের রীতি। বিশ্ব জগতের সবকিছু ও সবকিছু একই ভাবে অনুকৃত হয় না। যে রীতিতে গীতিকবিতা রচিত হয় সেভাবে কখনোই মহাকাব্য রচিত হয় না; কিংবা যে রীতিতে কমেডি রচিত সেই রীতিতে ট্রাজেডি রচিত হতে পারে না। সুতরাং শিল্প বা সাহিত্য অনুকরণের ফল হলেও তার যথার্থতা বিচারের জন্য একাধিক মানদণ্ড ও আদর্শ থাকা প্রয়োজন।

আরিস্টটল তার Poetics গ্রন্থে অনুকরণকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সেভাবে বিষয় বিচার করলে আরো একটি বিষয় পরিষ্কার প্রতিভাত হয়। কাব্যে, নাটকে, সাহিত্যে বা কোনো শিল্পে অনুকৃত বিষয়কে তিন ধরনের রূপ দেওয়া হয়—(১) যথাযথ ভাবে (২) বাস্তব বিষয়কে অনুকত বিষয়ের চাইতে উচ্চতর ভাবে, (৩) বাস্তব বিষয়কে অনুকৃত বিষয়ের চাইতে নিম্নতর ভাবে। অথচ যথাযথ রূপে অনুকরণকে আমরা সাধারণ ভাবে বলি নকল করা। এই নকল করার কোনো মাহাত্ম্য নেই। সাহিত্যে, শিল্পে, কাব্যে, নাটকে কবি বা সাহিত্যিক যখন হবহু বাতল ঘটনার অনুকরণ করেন, তখন তার রচিত বিষয় সাহিত্য পদবাচ্য হলেও উচ্চমানের সাহিত্য বলে গণ্য হয় না। এরূপ যথাযথ অনুকৃত সাহিত্য কখনোই কালজয়ী হতে পারে না। সংস্কৃতে একটা কথা আছে, "যদৃষ্টং তদলিখিতং", একেই যথাযথ অনুকরণ বলা যায়। এর মধ্যে সাহিত্য বা শিল্প সৃষ্টির কোনো ব্যাপার নেই। প্রাচীনকালে যেসব উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে, ঐতিহাসি এবং পুরাতাত্ত্বিকগণ সেইসব ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খও নিখুঁত বিবরণ প্রস্তুত করে থাকেন। কিন্তু এই বিবরণকে কেউ সাহিত্য বলে না। তার কারণ এর মধ্যে রস সৃষ্টির কোনো ব্যাপার নেই। অথচ সাহিত্যের আবেদন হৃদয়ের কাছে। হৃদয়ে রসের সঞ্চার ঘটানাোই সাহিত্যিকের কাজ। ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিকের ইতিহাস রচনা প্রাচীন ঘটনার নিখুঁত অনুসরণ। কিন্তু অ্যারিস্টটল মাইমেসিসকে অনুসরণ বলেননি। অনুসরণের সঙ্গে যখন কল্পনা মিশ্রিত হয়, তখনই তা অনুকরণ হয়ে ওঠে।

তাই পুরাতন ঘটনা অবলম্বনে যেমন ইতিহাস রচিত হয়, তেমনি কাব্য সাহিত্যও রচিত হয়। সেক্ষেত্রে কবি-সাহিত্যিকগণ শুধুমাত্র পুরাতনের অন্ধ অনুসরণ না করে নিজস্ব রুচি, প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যবোধ অনুয়ায়ী প্রতিটি ঘটনার বিষয় বস্তুকে নতুন করে সাজানো। এই সাজানোটাই কবির নিজস্ব, এটাই তার সৃষ্টি। আর এর ফলে তার রচনা বাস্তবের পরিচিত হতে এক অপার্থিব মহিমা লাভ করে। তখন ইতিহাস আর ইতিহাস থাকে না, তা রক্তমাংসে জীবন্ত হয়ে ওঠে। নেপোলিয়নের যুদ্ধ নিয়ে অনেক বড় বড় ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছে; কিন্তু তলস্তয়ের “ওয়ার এ্যান্ড পীস" নেপোলিয়নের যুগকে আমাদের চোখের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেন। আমরা যেন জীবন্ত নেপোলিয়নকে দেখতে পাই। এইভাবে

অ্যারিস্টটল মাইমেসিস শব্দটির যে ব্যাখ্যা দিলেন তার সহজ তাৎপর্য এই যে শিল্প-সাহিত্য মাত্রই বাস্তবের অনুকরণ, কিন্তু সেই অনুকরণের মধ্যে মানব হৃদয়ে চিরন্তন সৃষ্টির আবেদন থাকবে। যার সত্যতাকে আমরা কোনোদিনই অস্বীকার করতে পারবো না. বাস্তব সত্যের চেয়ে কাব্যের সত্য অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ এবং মহান।

৭.৫ 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে ব্যবহৃত ‘ক্যাথারসিস’

অ্যারিস্টটলের Poetics গ্রন্থের যে সকল শব্দ নিয়ে পরবর্তীকালে সমালোচক বিপন্নবোধ করেছেন, সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা জটিল ও দুরধিগম্য শব্দটি হল ক্যাথারসিস। শব্দটি সম্পর্কে এতখানি জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার প্রথম ও প্রধান অ্যারিস্টটল স্বকৃত ব্যাখ্যা না থাকা। Poetics গ্রন্থে তিনি মাত্র দু'বার শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এবার ট্রাজেডির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ষষ্ট অধ্যায়ে ও সপ্তদশ অধ্যায়ে ওরেসতেসের পাগলামি ও তজ্জনিত মুক্তির উল্লেখ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক বুচার উভয় ক্ষেত্রেই শব্দটির অর্থ করেছেন, Purification বা Purgation। বাংলায় আমরা এর অর্থ করতে পারি শোধন, শুদ্ধি, মোক্ষণ, বিমোক্ষণ বা পবিত্রীকরণ। যাইহোক,

শব্দটির সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে আমরা এর উৎপত্তি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা গ্রহণ করবো।

অ্যারিস্টটল কিংবা তার গুরু প্লেটো এই শব্দটি ব্যবহার করলেও এর উৎপত্তি বহু পূর্বে। গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যায় শব্দটি ব্যাপক ভাবে প্রয়োগ করা হতো। মনে হয় গ্রীক চিকিৎসার প্রবাদ পুরুষ হিপ্পোক্রেটিস এবং গ্যালেন এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে পিউরিফিকেশন বা শোধন প্রক্রিয়া বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। অ্যারিস্টটল ছিলেন চিকিৎসকের সন্তান। সুতরাং চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রতি তার জ্ঞান এবং আগ্রহ থাকাটা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। তিনি নিজেও জীবনতত্ত্বের উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং রাতত্ত্ব, কাব্যতত্ত্ব প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে জীবতত্ত্ব নির্ভর অনেক উপমা ও রূপক ব্যবহার করেছেন। তাই চিকিৎসা শাস্ত্র থেকে এই শব্দটি গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়।

কাব্যতত্ত্বে ক্যাথারসিস শব্দ ব্যবহার করার পূর্বে তিনি তার Politics গ্রন্থে এই শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন এবং কিছুটা ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। তবে সেক্ষেত্রে তিনি Musical ক্যাথারসিসের কথাটি বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"ব্যাখ্যা ছাড়াই বর্তমানে শুদ্ধিকরণ ব্যবহার করলাম, কিছু পরে যখন কাব্য-সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা হবে, তখন এ সম্পর্কে বিশদ করে বলব।" কিন্তু কাব্যতত্ত্বে এ সম্পর্কে তিনি বিশদ করে বলেননি। তবে পলিটিক্স গ্রন্থ থেকে ক্যাথারসিসের যেটুকু ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তা এইরূপ—তার বিচারে বহু মানুষ করুনা ও ভয়ের সহজ শিকার হয় এবং এক কথায় এরা আবেগপ্রবণ মানুষ। উদ্দীপনাময় গান শোনবার পরে। এদের চিত্তে একপ্রকার পরিবর্তন সাধিত হয়। এরা সবাই তখন শোধন ক্রিয়ার ধারা অতিক্রম করে এবং তার ফলে এরা আনন্দ লাভ করে।আজ পর্যন্ত ক্যাথারসিস শব্দটির হাত ব্যাখা হয়েছে, তা মূলত দুটি ধারাকে অবলম্বন করে—চিকিৎসা শাস্ত্রগত ও নৈতিক

বা ধর্মগত। স্কাইনো ইতালীয় ভাষায় এই শব্দের একটি টকিা প্রস্তুত করেছিলেন, বাইওয়াটার ইংরাজি ভাষায় তা অনুবাদ করেন এবং সেই সূত্র ধরে । আমরা স্কাইলনা প্রদত্ত চারটি সুত্রে উল্লেখ করতে পারি

১। আবেগ দেহের মূল উপদান বা হিউমারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত।

২। সঙ্গীত দেহের বিশেষ বিশেষ হিউমারের উপর প্রতিক্রিয়াশীল। সঙ্গীত দেহের অবাঞ্চনীয় উপাদানকে বহিস্কার করে।

৩। সঙ্গীত সেই অর্থে এক ধরণের ঔষধ।

৪। সেই ঔষধের প্রয়োগের ফলে আবেগের ভার কমে গিয়ে মন আসে শান্তি ও পরিতৃপ্তি।

রেনেসাঁসের সময়কাল পর্যন্ত মোটামুটি এটাই ছিল ক্যাথারসিসের ব্যাখ্যা। কিন্তু পরবর্তীকালে যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে। সকাস জানিয়েছেন-"নাটাশালা হাসপাতাল নয়" তিনি ক্যাথারসিসের চিকিৎসা সম্পর্কিত ব্যাখ্যাকে মেনে

নিতে পারেনি। ক্যাথারসিসের নৈতিক ব্যখ্যাও গ্রহণযোগ্য হয়নি অনেকের কাছে। যেমন বাই ওয়াটার বলেছেন "নাট্যশালা স্কুল নয়।"

ক্যাথারসিসের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় এবং নৈতিক ব্যাখাকে অস্বীকার করলে এর বাস্তবতার দিকটির আলোচনা বাকী থাকে। আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারি না নাট্যশালায় চরম দুঃখ-ব্যথা-বেদনার নাটক দেখে দর্শক মাত্রই আনন্দ লাভ করে। ট্রাজেডি মানেই দুঃখ-বেদনা-ভয়ঙ্করের কথা অথচ সেই দুঃখ-ব্যথা-বেদনার কথা শুনে বা দেখে দুঃখ বেড়ে যাবার বদলে তা হাস পায়। সাধারণ জীবনে একটা কথা আছে—কাটা দিয়ে কাটা তোলা বা বিষে বিষে বিষক্ষয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে কোনো-না-কোনো দুঃখ। সেই দুঃখের মনোভাব নিয়ে যখন আমরা আরেকটা দুঃখের নাটক দেখি তখন দুয়ে মিলে দুঃখটি হ্রাস পায়। কিন্তু এ ব্যাখ্যাও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। যদি তাই হতো তবে আমরা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে অপরের দুঃখ-কষ্ট দেখে নিজের দুঃখ ভুলতে পারতাম বা মনে একটা আনন্দ পেতাম। কিন্তু তা হয় না, বরং অপরের দুঃখ আমার দুঃখকে আরো বাড়িয়ে দেয়। তাই দুঃখ দিয়ে দুঃখ দূর করার তত্ত্বটি ক্যাথারসিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

আসলে বাস্তব জীবনের দুঃখ-দুর্দশা যত গভীব, যত ভয়ঙ্করই হোক না কেন, তা সামগ্রিক নয়। কাব্য-সাহিত্যের দুঃখ কোনো ব্যক্তির দুঃখ নয়, তা নৈব্যক্তিক অর্থাৎ সর্বজনীন ও সর্বকালীন। তা চিরায়ত বলেই বিরাট, বৃহৎ এবং অসামান্য। সেই বিরাট বৃহৎ দুখের সামনে দাঁড়িয়ে আমার বিশেষ ক্ষুদ্র দুঃখটি আমার কাছে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। অর্থাৎ তখন আমার মধ্যে আমার ব্যক্তিক দুঃখ হ্রাস পায়। যে কারণে আমি বা দর্শক ট্রাজেডি থেকে আনন্দ লাভ করি।

ভারতীয় অলংকারিকেরা ঠিক এভাবে না হলেও বিষয়টিকে আরেক দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। অলংকার শাস্ত্রে তারা বলেছেন, মানুষের অন্তরের ভাবগুলি রসে পরিণত হলে এক অতীন্দ্রিয় সুহানুভূতি লাভ করা যায়। মানব

চিত্তে বহু প্রকারের ভাব আছে যেমন—শোক, হাস্য, ভয়, জুগঙ্গা প্রভৃতি। এই সকল ভাবগুলি সাহিত্য-পাঠ বা মদ্যাভিনয় দর্শনের ফলে। করুন, হাস্য, ভয়, বীভৎস প্রভৃতি রসে পরিণত হয়। এই সকল রসের স্থান পাঠক বা দর্শকের চিত্তে ভাবগুলি রসে পরিণত হলে পাঠক বা দর্শকচিত্ত আনন্দে প্লাবিত হয়। তাই দঃখ, ব্যথা, বেদনা

প্রভৃতি করুণ রসের নাটক থেকে আমরা মহাসুখ লাভ করি। ক্যাথারসিস হল পাঠক বা দর্শক চিত্তে করুণ রস পরিস্ফুটনের একটি উপায় মাত্র। তাই এই শব্দটির অর্থ সম্পর্কে মোক্ষণের পরিবর্তে পরিশুদ্ধি কথাটি অনেক বেশি তাৎপর্যবহ।

৭.৬ কমেডি

নাটক ও কাব্যের বিরুদ্ধে প্লেটোর গভীর অভিযোগ ছিল। তার মতে কবিরা মৌলিক কোন কিছু সৃষ্টি করেন না, তারা অনুকরণের অনুকরণ করে। তাদের সত্য জ্ঞান নেই: বাস্তব জীবনের ছায়া নিয়ে তাদের কারবার। তাদের রচনা "are representations at the third remove from reality." হোমার বহুদর্শি বলে খ্যাত ছিলেন । কিন্তু লাইকারগাসের মতো কোন রাজ্যে শাসনতন্ত্র কিংবা সালনের মত তিনি আইন প্রণয়ন করেননি। কাব্যের গভীর ত্রুটি হল it has a terrible power to corrupt even

the best character, with very exceptions. প্লেটো বলেছেন যে, বাক্তিগত জীবনে আমরা দুঃখ ও শোককে সংযত রাখার প্রয়াস করে থাকি। কিন্তু নাটক দেখার ফলে সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। হয়ত এই যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, অপরের দুঃখে দুঃখ বোধ করা অথবা সহানুভূতি প্রদর্শনের মধ্যে কোন দোষ নেই। আবার এর মধ্যে আনন্দও আছে। কিন্তু প্লেটোর মতে

If we let ourselves feel excessively for the misfortunes of others. It will be difficult to restrain our feelings in our own. কমেডি প্রসঙ্গে তার বক্তব্য হল যে, প্রহসন মঞ্চে দেখে আমরা হাসি, বাড়িতে সেই বিষয় নিয়ে আমরা হাসি না। বরং সেই বিষয়ের কুশ্রীতাকে আমরা নিন্দা করে থাকি। সুতরাং মঞ্চের আমরা বিকৃত রুচির পরিচয় দান করি।

You are giving rein to your comic instinct, which your reason has restrained for fear. You may seem to be playing the fool, and bad taste in the theatre may insensibly lead you into becoming a buffoon at home

সুতরাং তার মতে poetry has no serious value or claim to truth.

কমেডির যে আনন্দ প্লেটোর মতে তাতে থাকে ক্ষতির আনন্দ। অপরের দুর্ভাগ্য বিড়ম্বনা দেখে একপ্রকার বিশেষ আনন্দ লাভ করা যায়। প্রাচীনকালে অ্যাটিক কমেডিতে ক্ষতি জনিত আনন্দ ছিল প্রধান উপাদান। তাই হবসের মতের সঙ্গে তার পার্থক্য রয়েছে। অপরের দুর্বলতা ও ত্রুটি দেখে আমাদের মনে অহমিকা জনিত যে গৌরব বোধ জাগে তাকে হবসের মতে কমেডির হাস্যরসের কারণ। কিন্তু অ্যারিস্টটলের মতে সেই হাস্যরসের সঙ্গে আনন্দের কোন সম্পর্ক নেই ।এই হাসি অবিমিশ্র আনন্দের প্রকাশ।সম্ভবত তাঁর মতে এর পেছনে আমাদের সহানুভূতির বোধ থাকে। প্লেটো বলেছেন যে কাব্য বাস্তবের অনুকরণ। কিন্তু যে অর্থে তিনি শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এটি মানব জীবনের চিরন্তন রূপ প্রকাশ করতে চায় ।এক কথায় একে বাস্তব জীবনের আদর্শ স্বরূপ প্রকাশ করে

ব্যাখ্যা করা যায়। যা আছে, যা প্রত্যক্ষগোচর তার রূপায়ন এর ধর্ম নয়। আদর্শীকরণ অর্থ এটা নয় যে বাস্তব কে অস্বীকার করে কোন সৌন্দর্য আরোপ করা। বাস্তবে যে তুচ্ছতা ও আকস্মিকতা জড়িত থাকে তা অপসারিত করে তার বিশিষ্ট রূপকে প্রকাশিত করার নাম আদর্শীকরণ। এই বিশেষ পরিচয় নিত্য সত্যকে ব্যক্ত করে থাকে। ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের পার্থক্য এখানেই যে ইতিহাস বিশ্বাসের পরিচয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, কাব্য বিশেষকে অতিক্রম করে সার্বজনীন সত্যের পরিচয় দান করে থাকে। অ্যারিস্টটলের ট্রাজেডির চরিত্র সাধারণ মানুষ নয়। তার চরিত্র প্রকাশ করতে গেলে চিত্রকরের আদর্শ অনুসরণ করতে হয়। চিত্রকর চিত্র আঁকতে মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেন আবার বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ ফুটিয়ে তোলেন। নাট্যকার অর্থাৎ কবি কখনো চরিত্রের দুর্বলতা আঁকার সময় পূর্বোক্ত আদর্শের কথা স্মরণ রাখবেন। হোমার যেভাবে একিলিসের চরিত্র একেছেন,তাকেও তা করতে হবে।

অ্যারিস্টটলের মতে এপিক, ট্রাজেডি, কমেডি ও এমনকি সংগীতও অনুকরণ। তাদের মধ্যে পার্থক্য হলো মাধ্যম, বিষয় ও রীতিগত। ছন্দ ,ভাষা ও সুর একত্রে বা পৃথকভাবে এদের উপকরণ। ট্রাজেডি ও কমেডির ছন্দ, সুর ও কাব্যভাষা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কবির মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী কাব্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। একশ্রেণীতে আছে মহৎ ঘটনা বর্ণনা এবং মহৎ চরিত্রের সমাবেশ এবং অন্য শ্রেণীতে আছে সাধারণ মানুষ। দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে পাওয়া গেল ব্যঙ্গমূলক কবিতা। হোমার রচিত ইলিয়াড ও ওডিসি যেমন ঘটনাবলীর বর্ণনাও চরিত্রের অভিব্যক্তিতে পরবর্তীকালে ট্রাজেডি সঙ্গে সম্পৃক্ত, তেমনি তার Margites কমেডির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। ট্রাজেডি যেরকম ডিথিরাম্ব থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তেমনই কমেডি অ্যারিস্টটলের মতে ‘with those of the phallic songs which still survive as institutions in many of our cities’.

কালক্রমে কমেডি হল মানব জীবনের অনুকরণ। তবে ট্রাজেডিতে যেরূপ নায়ক চরিত্র মহৎ রূপে দেখা যায় কমেডিতে তা নয়। অ্যারিস্টোটল বলেছেন ‘ As for Comedy, it is an imitation of men worse than the average.’

এর অর্থ এই নয় যে মানুষের চরিত্রের মধ্যে সব প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে। বরং

তার মধ্যে থাকবে হাস্যকর অসঙ্গতি। মানুষের চরিত্রের মধ্যে অসঙ্গতি ও বৈসাদৃশ্য থাকে তা দেখানো হলে সকলে কৌতুক অনুভব করে থাকে। অ্যারিস্টটল বলেছেন 'The ridiculous may be defined as a mistake or deformity not productive of pain or harm to others.'

যা অসংগত তাকে যদি বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় তবে তা বিসদৃশ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু নাটকে অর্থাৎ কমেডিতে তাহলে তা আমাদের আনন্দ দান করে থাকে। বাস্তব জীবনে যাকে পাপ বলি তা পরিহার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু সাহিত্যে তার পরিচয় সুন্দরের দাবি নিয়ে আসে। ইয়াগো অথবা তৃতীয় রিচার্ডের চরিত্র আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায় না। শিল্পের মাধ্যমে তাদের আবির্ভাবকে সুন্দর না বলে উপায় নেই। তাদের কার্যকলাপের মধ্যে শিল্পীর সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করা যায় বলে তারা সুন্দর। প্রাচীন অ্যাটিক কমেডিতে ছিল ব্যক্তিগত ব্যঙ্গের প্রবণতা। তা পাঠ করে এক প্রকার ক্ষতি জনিত আনন্দ পাওয়া যেত। প্লেটো তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। অ্যারিস্টটল তা গ্রহণ করেননি। ক্ষতির ভাব না থাকলেও আনন্দ লাভ করা যায়। তিনি অসঙ্গতির ওপর জোর দিয়েছেন। এটিই তার মতে 'is a species of the ugly'। আবার একে তিনি ত্রুটি অথবা বিসদৃশ অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। এই ত্রুটি আমাদের মনে হাস্যরস সৃষ্টি করে, কিন্তু এর সঙ্গে আঘাতজনিত আনন্দের কোন সম্বন্ধ নেই। ডিফর্মিটি বলতে প্রথমত শারীরিক ত্রুটি অথবা সুষমার অভাব বোঝানো হয়। ট্র্যাজেডির আখ্যান প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, এরমধ্যে পারম্পর্য থাকলে তা সুন্দর হবে। এই সৌন্দর্যকে তিনি জীবিত প্রাণীর দেহের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন যে সৌন্দর্য হলো পরিমিত দৈর্ঘ্য ও সামঞ্জস্যের প্রকাশ।

দেহের আকৃতিও সুষমার ওপর সৌন্দর্য নির্ভর করে সেখানে কোনো ত্রুটি ঘটলে যাকে তিনি ডিফর্মিটি বলেছেন। তা হাসির উদ্রেক ঘটায়। শারীরিক ত্রুটি ছাড়া মানুষের দুর্বলতা বা নির্বুদ্ধিতার সাধারণ ভুলগুলো হাস্যরস সৃষ্টি করে থাকে। সুতরাং স্পষ্ট যে অ্যারিস্টটল ব্যক্তিগত ব্যঙ্গকে বাদ দিয়েছেন সম্ভবত তিনি অ্যারিস্টোফেনিস এর কমেডিকে সমর্থন করতে পারেননি। তার মতে কমেডিতে ব্যক্তির নাম থাকবে না, সাধারণভাবে চরিত্রের পরিচয় ব্যক্ত করবে ।এরিস্টোফেনিস যদিও ঐতিহাসিক চরিত্র

সমূহের নাম করেছেন। তাদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছেন। তারা সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। তিনি তার যুগের মানসিক প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য সমূহকে বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন। এই চরিত্রসমূহ একটি বিষয়ের নানাদিক ফুটিয়ে তোলে। সম্ভবত সেখানে বিতর্কের অবকাশ দেখা যায়।চরিত্রগুলি শ্রেণীরূপের পরিচয় দান করে। মানুষের দুর্বলতা অবলম্বন করে তিনি আখ্যান রচনা করেছেন। এই আখ্যানের মধ্যে আদি মধ্য অন্ত্য পর্যায় পারম্পর্য দেখা যায়।

ট্র্যাজেডি ও কমেডি জীবনের চিরন্তন রূপ প্রকাশ করে বটে কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। ট্র্যাজেডি যেমন জীবনের গভীরে প্রবেশ করে তার স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করে, কমেডি মানব চরিত্রের একটি দিক ত্রুটি-বিচ্যুতি অসঙ্গতি নির্বাচন করে নেয়। তাকে দূরীভূত করতে চায় না বরং তার মধ্যে জীবন সত্যের একটি দিক দেখতে পেয়ে আনন্দিত হয়। চরিত্রের পূর্ণবৃত্ত রচনা করার দিকে কমেডির মনোযোগ থাকে না। চরিত্রের যে দিকটি তার মধ্যে প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে ট্র্যাজিক স্ফুরণের আভাস থাকলেও হাস্য উদ্দীপক দিকটি উদঘাটিত হয়ে থাকে।

কমেডি কবে কোথায় সৃষ্টি হয়েছে তা বলা কঠিন। অ্যারিস্টটল এর সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করেননি। ডোরিয়ানগণ কমেডির স্রষ্টা ও এই নাম তাদের গ্রাম কোমাই থেকে এসেছে। ডোরিয়ানদের রঙ্গ-ব্যঙ্গ নীতি গ্রীসে সবথেকে বেশি প্রচলিত ছিল। কমেডির আখ্যান সিসিলিতে উদ্ভূত হয়েছিল। পরে গ্রীসের কবি ক্রেটিস কমেডি থেকে ব্যঙ্গ বাদ দিয়ে সাধারন জীবনের পরিচয় ব্যক্ত করেছেন। কমেডির সংজ্ঞা নিয়ে পরবর্তীকালে অনেক সমালোচনা হয়েছে। মেরেডিথ তার the idea of comedy ও বাগসঁ তার Laughter রচনায় কমেডির বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। মেরেডিথের মতে কমেডি আমাদের মস্তিষ্কের নিকট আবেদন করে । তা বিশ্লেষনধর্মী ও তার কাজ হচ্ছে শিক্ষাদান করা। মলেয়ারের নাটক থেকে এর পরিচয় পাওয়া যায়। কমেডির হাসির মধ্যে আছে objectivity. ব্যক্তিকে এখানে বিদ্রুপ করা হয় ঠিকই কিন্তু তা ব্যক্তিগত নয় এবং তাতে কোনো উত্তাপ থাকে না। যেমন -

As you like it নাটকে জ্যাকস ডিউক এর কাছে ভাঁড় হয়ে সকলকে বিদ্রুপ করার

অধিকার প্রার্থনা করেছে। সে ডিউককে বলেছে

What woman in the city do I name,

When that I say the city women bears

The cost of Princess on unworthy shoulders?

কিন্তু এ জাতীয় কমেডির সঙ্গে হৃদয়ের কোনো যোগ নেই। এখানে হাসি আছে কিন্তু তা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। শেক্সপিয়ারের নাটকের পাঠকরা প্রাণখোলা হাসি পছন্দ করে।

৭.৭ অনুশীলনী

১।মহাকাব্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করো।

২। মহাকাব্য ও ট্রাজেডির সম্পর্ক আলোচনা করো।

৩। ট্রাজেডির ত্রিবিধ ঐক্য কি?

৪। মাইমেসিস বা অনুকরণ তত্ত্ব কাকে বলে বিশদে আলোচনা করো।

৫। ক্যাথ্যরসিস শব্দটির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করো।

৬। কমেডি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৭.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১।অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স – ভবানীগোপাল সান্যাল

২।অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব –সাধন কুমার ভট্টাচার্য

৩।কাব্যতত্ত্ব অ্যারিস্টটল – শিশিরকুমার দাশ